আমার পরমারাধ্য

পিতৃদেব

৺ধীরেশ চন্দ্র সেনের

স্মরণে—

ভূমিকা

'শোনো কে বাজায়' উপন্যাসটির পটভূমি সত্তর বা আশির দশকের কলকাতা শহর। নায়ক এক মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবক। সে সেতার বাজিয়ে কোনোমতে দিন গুজরাণ করে এবং ঐ পথেই অর্থ এবং যশের সন্ধানে ফিরছে। নায়ক এবং উপন্যাস—দুই-ই সফল হল কিনা, পাঠক তার বিচার করবেন।

উপন্যাসটির মূল গল্পাংশ আমার বন্ধু সত্যজিৎ জয় পালিত-এর 'মুভি স্ক্রিপ্ট' থেকে পেয়েছি। সত্যজিৎকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

উপন্যাসটি লেখা শুরু হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। আমার স্ত্রী শ্রীমতী তৃপ্তি সেনের নিরন্তর তাগিদ না থাকলে উপন্যাসটি কোনোদিন শেষ হত কিনা জানি না। তৃপ্তি সেনের ঋণ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

সব শেষে, শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের (করুণা প্রকাশনীর স্বনামধন্য বামবাবু) কথা উল্লেখ না করলে এই ভূমিকা অসমাপ্ত থেকে যাবে। প্রকাশক বামবাবুর নিষ্ঠা এবং দরদের জন্যেই বইটি ছাপাখানার গণ্ডি ছাড়িয়ে পাঠকদের হাতে পড়েছে। বামবাবুর ঋণ কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি।

উপন্যাসটি পাঠকের ভালো লাগলে লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

শোনো কে বাজায়

এক

মাঘ মাস। রবিবারের সকাল। হালকা মিষ্টি মেজাজ নিয়ে শহর কলকাতা জেগে উঠেছে। উত্তর কলকাতার এক মধ্যবিত্ত অঞ্চলের ভিতর গলি, তস্য গলি। মান্ধাতার আমলের ছোট একটা দোতলা বাড়ির নিচের তলার ঘর থেকে সেতারের টুং টাং আওয়াজ ভেসে আসছে।

বর্তমানে বাড়িটির মালিক হ্ল দুই ভাই, রণজিৎ রায় এবং শুভজিৎ রায়। বাবা বছর কয়েক আগে মারা গেছেন। তখন থেকে রণজিতের উপর সংসারের ভার। সে একটি সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। বিবাহিত। একটি মেয়ে, বয়স সাত। মেয়ের নাম যদিও প্রতিমা, সবাই ওকে ভুতু বলে ডাকে। এ বাড়িতে ভুতুই হ'ল সকলের গার্জেন। সারাদিন সে ঠাকুমা, মা, বাবা এবং কাকার উপর সর্দারি করে বেড়ায়। সাত বছরের মেয়ের মুখে পাকা পাকা কথা শুনতে সকলেরই ভাল লাগে। তাই, সবাই ওকে সাধ্যমতো প্রশ্রয় দেয়।

বাইরের ঘরটা ছোট ভাই শুভজিতের দখলে। সে দাদার থেকে বয়সে অনেক ছোট। ছেলেবেলায় দাদার কোলে পিঠে চেপে মানুষ হয়েছে। শুভজিতের বাবা ছিলেন শিল্পানুরাগী মানুষ। অবস্থা সামান্য ছিল, কিন্তু শিল্পচর্চার পিছনে সারাজীবন যথেষ্ট সময় এবং অর্থ ব্যয় করে গেছেন। নাচ, গান, বাজনা, সবই অল্পসল্প জানতেন। টাকা পয়সার টানাটানির মধ্যেও তিনি সাধ্যমতো এবং সুযোগমতো বিভিন্ন যন্ত্র সংগ্রহ করতেন। ঘরে একটা সেতার ছিল, একটা এস্রাজ ছিল, এক জোড়া তবলা ছিল, একটা বেহালাও ছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন, বাড়ির মধ্যে একমাত্র ছোট ছেলেরই গান বাজনার দিকে ঝোঁক আছে। শুভজিতের যখন পাঁচবছর বয়েস, তখন উনি ওকে নাচ শেখাতেন। গৃহিনী মাঝে মাঝে রাগারাগি করতেন, বলতেন, 'যত বয়েস বাড়ছে, তত আদিখ্যেতা ও বাড়ছে। বুড়ো বয়েসে যাত্রার দলের সং-এর মতো ধেই ধেই করে নাচ হচ্ছে।' উনি এসব কথায় কর্ণপাত করতেন না, হেসে উড়িয়ে দিতেন।

শুভজিতের বয়েস যখন দশ বছর, সে একদিন বলল, সে সেতার শিখবে।

কর্তা মোটামুটি সেতার জানতেন। ওস্তাদ নন, কিন্তু তারের যন্ত্রে সব রকম রাগরাগিনীর বোল তুলতে পারতেন। তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা, আমি যতটা জানি, শেখাবো।' তিনি নেহাৎ কম জানতেন না, যতদূর সাধ্য, শুভজিতকে শেখালেন। এই ভাবে বছর দশ-এগারো কেটে গেল।

বি.এ. পাশ করে শুভজিৎ নতুন বায়না ধরল, সে বেনারসের পণ্ডিত মহাদেবপ্রসাদ মিশ্রের কাছে গিয়ে সেতার শিখবে। কর্তার তখন বয়েস হয়ে গেছে, তিনি একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। শুভজিৎ বলল, 'আমাকে হাজার চারেক টাকা দাও। একবার ওখানে যেতে পারলে, ওখানকার খরচ আমি যেভাবে হোক, চালিয়ে নেব।' শুভজিতের উৎসাহ দেখে উনি আর আপত্তি করলেন না। বেনারসে শুভজিৎ মোট আড়াই বছর ছিল। বাবার কাছে তার প্রাথমিক শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল, বেনারসে গিয়ে সে মোটামুটি রকমের ওস্তাদ হয়ে ফিরে এল। বাইরের ঘরের দেয়ালে গুরুর একটা ছবি টাঙালো ; এবং রোজ সকাল-সন্ধ্যায় গুরুর প্রতিকৃতির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ানো অভ্যাস করল। দশটা-পাঁচটার চাকরির প্রতি ওর কোনো কালেই বিশেষ মোহ ছিল না ; বেনারস থেকে ফিরে বাইরের ঘরটাতে ও সেতারের স্কুল খুলে বসল। সে-ও আজ থেকে সাত আট বছর আগেকার কথা। ইতিমধ্যে সংসারে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাবাও মারা গেছেন। পাড়ার সকলেই শুভজিৎকে চেনে, পাড়ার বাইরেও সেতার বাজানোর জন্যে অনেক জায়গা থেকে ওর ডাক আসে। তবে, এক ডাকে চিনবার মতো নাম এখনও ওর হয় নি।

ঘরের ভিতর সেতার হাতে বসেছিল দশ বছর বয়েসের একটি ছেলে। শুভজিৎ তাকে শেখাচ্ছিল। ছেলেটির নাম রানা। লাজুক-লাজুক মুখ, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। সেতারে সে একটা নতুন বোল তুলবার চেষ্টা করছে। রানার পাশে বসে আছেন তার মা।

শুভজিৎদের বাড়িটা অনেক কালের। বাড়ির বাইরের দেয়াল ইঁট-বের-করা, তার কোণে কোণে শ্যাওলা। এককালে যে সিমেণ্টের পলেস্তারা ছিল, তা এখন বোঝবার যো নেই। বাড়ির প্যাটার্নও মান্ধাতা আমলের। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা সরু গলি, বাইরের ঘরটা গলির ডানদিকে, বাঁ দিকে উঠোন। বাকি ঘরগুলো উঠোনের অন্যপাশে। দোতলার

আদ্দেকটা ভাড়াটে পাঁচু লাহিড়ীর দখলে। সে ছোটখাটো একটা ব্যবসার মালিক।

বাইরের ঘরটা আকৃতিতে বেশ বড়ো। ঘরের একদিকে একটা ছোট টেবিল' তার উপর সাজানো রয়েছে কয়েকটা বই, টেবিলের চারপাশে চারটে চেয়ার পাতা। টেবিলের উপর দেয়ালে টাঙানো রয়েছে শুভজিতের গুরুদেবের ছবি। ছবির সামনে একটা ধূপকাঠি জ্বলছে। গুরুদেবের ছবির মাথার উপর ঝুলছে বিশাল একটা ঘড়ি, ইংরিজিতে যাকে বলে 'গ্র্যান্ডফাদার ক্লক'। ঘরের অন্যদিকটায় দেয়ালের সংগে লাগানো রয়েছে পুরনো আমলের একটা দেরাজ. তার সামনে, মেজের উপর সতরঞ্চি পাতা। তাছাড়া, ঘরের দু' কোণে দু'টো মোড়াও আছে।

যে লোকটি সেতারের সংগে তবলা বাজাচ্ছিল, তার নাম বাবলু। সে ঐ পাড়ারই বাসিন্দা। শুভজিতের থেকে সাত আট বছরের ছোট। মাঝে মাঝে যখন ঝোঁক চাপে, তখন এদিক ওদিক চাকরির ধান্দায় ঘোরে। তাছাড়া, দিনের বেশির ভাগ সময়, শুভজিতের ঘরে বসে তবলায় চাঁটি মারে। শুভজিতের সংগে যখন কন্‌সার্টে যায়, তখন ওরও অল্প সল্প রোজগার হয়। প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য, কিন্তু, বাবলু তাতেই খুশি। পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে, তারা কষ্ট পেতে জানে না; বাবলু তাদেরই একজন। ও যখন যেখানে থাকে, সেখানেই একটা আনন্দের হাট বসে যায়।

ঘরের কোণে গুটিশুটি মেরে বসে ছিল ছোটো খাটো আরও একটি মানুষ, তার নাম চন্দ্রানী। বাবলুর সমবয়স্ক, একই পাড়ার মেয়ে, ছোট বেলা থেকে বাবলুর সংগে রাস্তায় কানামাছি এবং ডাংগুলি খেলে মানুষ হয়েছে। শুভজিতের কাছে সেতার শিখেছে, তাছাড়া ওর গানের গলাও চমৎকার।

রানা হঠাৎ বাজনা থামিয়ে দিয়ে শুভজিতের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখল, তার পর মাথাটা নিচু করল। শুভজিৎ মুখ তুলে বলল, 'কী হল রে? থামলি কেন?'

রানা শুভজিতের কথার উত্তর দিল না, শুধু আড় চোখে ওর দিকে চেয়ে দেখল আর একবার। শুভজিৎ একটু হেসে বলল, 'বেশ তো বাজাচ্ছিলি, আর একটু ফীলিং দিয়ে বাজা।'

রানা নিরুত্তর।

'কী রে? কথা নেই কেন রে?' শুভজিৎ আবার বলল। তারপর,

মুখ তুলে চেয়ে দেখল, রানার চোখ জানালার দিকে। মুখ ফিরিয়ে দেখল, জানালার বাইরে ভুতু দাঁড়িয়ে। শুভজিৎ চোখ পাকিয়ে বলল, 'অ্যাই, তুই এখানে কী করছিস্? আটের ঘরের নামতা মুখস্ত হয়েছে?'

ভুতু ছোট কথা কানে নেবার পাত্রী নয়, সে গম্ভীর গলায় বলল, 'মা তোমাকে চান করতে যেতে বলেছে।'

শুভজিৎ মুখটাকে যথাসাধ্য গম্ভীর করে বলল, 'পালা এখান থেকে।'

ভুতু দমবার মেয়ে নয়, সে বলল, 'বেলা গেলে, তোমার গা গরম হবে যে—'

শুভজিৎ একবার বাবলুর দিকে, একবার চন্দ্রানীর দিকে চাইল, তারপর রানার মায়ের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। বাবলু বলল, 'অ্যাই, ধর্ তো মেয়েটাকে, ওর বেণীটা কেটে দিই!'

ভুতু দৌড়ে পালিয়ে গেল। দূর থেকে ওর গলা শোনা গেল, 'ও মা, দ্যাখো না, বাবলুদা কী বলছে!'

শুভজিৎ সেতারটা রানার হাত থেকে তুলে নিয়ে নিজের কোলের উপর রাখল। 'আমি বাজাচ্ছি, তুই চোখ বুজে শোন্,' রানাকে বলল শুভজিৎ, 'দেখবি, তোর ঠিক মনে হবে, তোর চোখের সামনে ময়ূর নাচছে।'

শুভজিতের হাতের ছোঁয়ায় সেতারটাতে আনন্দের বান ডেকে উঠল। সরল নিষ্পাপ এক শিশুর অনাবিল আনন্দোচ্ছ্বাস ধ্বনিত হতে লাগল ওর বাজনার মধ্যে। 'তোর মা যখন তোর হাতে সন্দেশ দেন,' শুভজিৎ তার তরুণ ছাত্রকে বলল, 'তখন মনে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি আনন্দ করে বাজা।'

জানালার বাইরে আবার ভুতুর গলা শোনা গেল, 'মা তোমার জন্যে পারশে মাছ ভাজছে, এবার তাড়াতাড়ি চান করতে যাও।' শুভজিৎ বাজনা থামিয়ে সেতারটাকে মেঝের উপর শুইয়ে রাখল।

রানা এবং তার মা বিদায় নিতে-না-নিতেই বাড়িতে নতুন মানুষের আবির্ভাব হল। শুভজিৎ মুখ তুলে দেখল, দরজায় দাঁড়িয়ে পারমিতা এবং বিজন। পারমিতা শুভজিতের ছাত্রী, বিজন তার দাদা। পারমিতা এগিয়ে এসে শুভজিতের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল; বিজন ওর হাতে লাল রঙের একটা ছাপানো কার্ড ধরিয়ে দিল। পারমিতার বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। শুভজিৎ কার্ডখানা একবার উল্টে পাল্টে দেখল, পারমিতার লজ্জানত

মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখল, ওর মাথায় হত ছোঁয়ালো একবার, তারপর লঘুস্বরে বলল, 'বাঃ, এতো খুব ভালো খবর! যা ভেতরে গিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আয়।'

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ভুতু, সে উঠোনের দিকে ফিরে চিৎকার করে বাড়ির সকলকে পারমিতার আসন্ন বিয়ের সংবাদ জানিয়ে দিল। বাবলু বলল, 'দাঁড়া, এবার তোর জন্যে একটা বর খুঁজে আনব।' এর উত্তরে বাবলুর দিকে চেয়ে ভেংচি কাটল ভুতু।

বিজন আর পারমিতা ঘরের বাইরে যেতেই বাবলু তবলা-জোড়া একটু দূরে ঠেলে দিয়ে, দুহাতে মাথাটাকে চেপে ধরে, 'উঃ' বলে আওয়াজ করে উঠল।

চন্দ্রানী জিগ্যেস করল, 'কী হল ?'

হতাশ ভংগী করে বাবলু বলল, 'কী আর হবে ? আবার একটা খসলো ! বিয়ে করে কে কবে বড়লোক হয়েছে, বল্ দেখি ?'

শুভজিৎ রাগতে গিয়েও বাবলুর মুখ ভংগী দেখে হেসে ফেলল। তারপর চন্দ্রানীকে বলল, 'সেদিন যে 'মান্ড্' রাগটা বাজাতে শেখালুম, সেটা একবার বাজা দেখি !'

চন্দ্রানী লজ্জিত মুখে বলল, 'এখন নয়, পরে বাজাবো। এখন ঠিক পারবো না।'

শুভজিৎ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোদের সবসময় একটা-না-একটা ওজর!' তারপর দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমি স্নান করতে চললুম। তুই ততক্ষণ রেওয়াজ কর্। ফাঁকি দিস্ না।'

এর উত্তরে চন্দ্রানী মুখে কিছু না বলে আস্তে আস্তে সেতারে সুর দিতে আরম্ভ করল। শুভজিৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বাবলু বলে উঠল, 'রেখে দে তোর সেতার। একটা বিলিতি গান ধর্ দেখি, আমি একটু মেজাজ করে তবলাটা বাজিয়ে নিই।'

চন্দ্রানীর মুখে হাসি ফুটে উঠল, ও নিচুগলায় বলল, 'না, না, এখন নয়। সিঙ্গি খেপে যাবে।'

এককালে শুভজিৎদের পৈত্রিক পদবী ছিল 'সিংহ'। তারপর ওদের পরিবারে কে যেন কবে 'রায়' উপাধি পেয়েছিলেন। শুভজিতের বাবা নামের শেষে 'সিংহ রায়' লিখতেন। রণজিৎ এবং শুভজিৎ 'সিংহ রায়' না লিখে,

শুধু 'রায়' লেখে। বাবলু আর চন্দ্রানী ঘটনাটা জানত, তাই শুভজিতের আড়ালে ওরা ওকে 'সিঙ্গি' বলে ডাকে।

বাবলু বলে উঠল, 'ভয় নেই, সিঙ্গি এখন কলের ঘরে। আমিও চুটিয়ে তবলাটা বাজিয়ে নিই। সকাল থেকে বাজনা শেখানোর সঙ্গে ঠেকা দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছি।'

একটু কাল ইতস্তত করে, চন্দ্রানী শেষ পর্যন্ত 'মান্ড্' রাগের উপর একটা 'পপ' গান ধরল। গানের উষ্ণতায় এবং মাধুর্যে ঘর ভরে উঠল। গানের সংগে মহা উৎসাহে মনের আনন্দে তবলায় চাঁটি মারতে লাগল বাবলু।

এদিকে বিজন আর পারমিতা মিষ্টিমুখ করে, মাকে আর এক দফা প্রণাম সেরে বিদায় নিল। বাইরে বেরিয়ে, একটু এগিয়ে দেখে, দুটি লোক এদিক ওদিক চাইতে চাইতে এগিয়ে আসছে। ওদের মধ্যে একজনের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মধ্যে. মুখে সাহেবী ধরণে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, গোঁফ নেই। চোখে ধোঁয়াটে চশমা। লোকটির নাম তিমিরবরণ হালদার। বিলিতি 'পপ' সঙ্গীতের ওস্তাদ। ইদানীং 'লাভ ইন কালিম্পং' ছবিতে 'সংগীত পরিচালক' হিসেবে কাজ করেছে। ইতিমধ্যে অল্পসল্প নামডাকও হয়েছে। তিমিরের সংগে রয়েছে ওর মাসতুতো ভাই গৌতম। গৌতম তিমিরের থেকে বয়সে অনেক ছোট ; একটা প্রেসে কাজ করে।

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে বিজনকে দেখে তিমির জিগ্যেস করল, 'ভাই, আপনি বলতে পারেন, শুভজিৎ রায়ের বাড়ি কোন্‌টা ?'

বিজন কাগজে বারকয়েক তিমিরের ছবি দেখেছিল, ওর মুখে বিগলিত হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আপনি তিমির হালদার না ?'

তিমির হাসি মুখে ঘাড় নাড়ল। বিজন পারমিতাকে বলল, 'জানিস, উনি 'লাভ ইন কালিম্পঙ'-এর মিউজিক ডিরেক্টর।' ভাইবোন দু'জনে শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টিতে তিমির হালদারের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

তিমির একটু হেসে আবার জিগ্যেস করল, 'আপনারা শুভজিৎ রায়ের বাড়িটা চেনেন কি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ তো,—ওখানেই তো এতক্ষণ ছিলাম আমরা,' বলে' বিজন হাত তুলে বাড়িটাকে নির্দেশ করল। ওর মুখ দেখে মনে হল, তিমিরের জন্যে এই সামান্য কাজটুকু করতে পেরে ও কৃতার্থ হয়ে গেছে।

তিমির আর গৌতম ওদের পিছনে ফেলে গলির ভিতর এগিয়ে গেল।

চন্দ্রানীর গানের রেশ জানলা দিয়ে বাইরে ভেসে আসছিল। গানের সুর কানে যেতে তিমিরের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, গৌতমের হাত ধরে দ্রুত পায়ে শুভজিৎদের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

চন্দ্রানী তখনও 'মান্ড্' রাগের 'পপ' গানটি গেয়ে চলেছে এবং বাবলু মহা উৎসাহে গানের সংগে তবলা সংগত করছে। তিমির উত্তেজিত হয়ে গৌতমকে বলল, 'কী গলারে! একে যদি আমার টীমে পাই, তবে এদেশে আমার আর জুড়ি থাকবে না। আহা-হা, এই খানে একটু সিন্থেসাই-জারের টাচ্'—বলে, জানালার বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু হাত নেড়ে নেড়ে কাল্পনিক সিন্থেসাইজারটা বাজাতে লাগল তিমির।

ইতিমধ্যে স্নান সেরে ঘরে ফিরে এল শুভজিৎ। শুভজিতের পায়ের আওয়াজ বাইরে থেকে কানে যেতেই গান থামিয়ে দিয়েছিল চন্দ্রানী। ওরা জানে, শুভজিৎ 'পপ' পছন্দ করে না। 'পপ' সংগীতকে ও বলে 'পাপ' সংগীত।

ঘরে ঢুকে গুরুর প্রতিকৃতির সামনে গিয়ে নমস্কার করল শুভজিৎ। বাবলু এবং চন্দ্রানীও ওর দেখাদেখি হাত তুলে গুরুকে প্রণাম জানাল।

এমন সময় ঘরের ভিতর এল তিমির এবং গৌতম। 'লাভ ইন কালিম্পং'-এর সংগীতস্রষ্টা তিমির হালদারকে বাবলুও চিনতে পেরেছিল। সে মহা উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরে! তিমির বাবু না! আসুন, আসুন, কী ব্যাপার?'

ব্যাপারটা কী, তা প্রকাশ করে বলল গৌতম। গৌতম যে প্রেসে কাজ করে, সেখানে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে প্রত্যেকবছর জলসা হয়। সেই সুবাদেই ওদের আসা। তিমির গৌতমের দাদা। তাই সে সংগে এসেছে। গৌতম অনেক জায়গায় তিমিরকে সংগে নিয়ে যায়; জানে, তিমির সংগে থাকলে বাইরের লোকের চোখে ওর দাম অনেক বেড়ে যাবে। ওরা শুভজিৎকে সরস্বতী পুজোর জলসায় সেতার বাজাবার জন্যে অনুরোধ জানাল।

বাবলু চৌকস ছেলে। সে শুভজিৎকে কথা বলতে না দিয়ে বলে উঠল, 'শুভদা আজকাল যা বাজাচ্ছে না, আপনাদের আর কী বলব! তা, আপনারা কী দেবেন—টেবেন?'

ওরা পারিশ্রমিক হিসেবে চারশো টাকা দিতে চাইল। শুভজিৎ ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে তেমন পটু নয়। সে লজ্জিত মুখে মাথা নেড়ে

ওদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। বাবলুরও মহা আনন্দ, সেতার বাজিয়ে এত-গুলো টাকা শুভজিৎ আগে কখনো পায় নি।

এমন সময় জানালার বাইরে ভুতুকে দেখা গেল। শুভজিৎ ওকে দেখে ডেকে বলল, 'ভুতু, এদিকে শুনে যা তো—।

ভুতু উত্তরে বলল, 'চা তো? এখন চা হবে না। মা কাপড় কাচছে।' ভুতুর কথায় শুভজিৎ একটু অপ্রস্তুত হল, চন্দ্রানী আর বাবলু হেসে ফেলল। তিমিরও হাসল, বলল, 'না, না, এখন চায়ের দরকার নেই। আমাদের এখুনি উঠতে হবে।'

কখন, কীভাবে, কোথায়, জলসাতে গিয়ে পোঁছতে হবে, সে ব্যাপারে বাবলুই তিমিরের সংগে কথাবার্তা বলে নিল, তারপর ওদের এগিয়ে দিতে ওদের সংগে সংগে রাস্তায় এসে নামল।

শুভজিৎ তার আসনে বসতেই চন্দ্রানী 'মান্ড্' রাগটা সেতারে বাজাতে আরম্ভ করেছিল। এক মিনিট বাদে বাবলু ঘরে ফিরে এসে ধেই ধেই করে কোমর দুলিয়ে নাচতে আরম্ভ করল। হঠাৎ নাচ থামিয়ে চন্দ্রানীর দিকে ফিরে মুখ ভেংচে বলে উঠল, 'এই, থামা তোর বাজনা', তারপর শুভর দিকে ফিরে বলল, 'শুভদা,' আমি এখনই গরম গরম জিলিপি খাব, পাঁচটা টাকা খসাও দেখি।'

আকস্মিক অর্থাগমের সম্ভাবনায় শুভর মনটাও খুশিতে ভরপুর ছিল, সে দেরাজ থেকে টাকা বার করতে করতে বলল, 'একটু দেরিতে ভাত খাব এখন, তুই বাড়ির ভেতর থেকে কেটলিটা সংগে নিয়ে যা, কয়েক কাপ চাও নিয়ে আসিস্।'

দুই

'বীণাবাদিনী' প্রকাশন ভবনের অবস্থান বৌবাজার অঞ্চলের একটা গলির মধ্যে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই প্রেসের পত্তন করেন অক্ষয় কুমার শিকদার। তখন তাঁর বয়েস ছিল একুশ। শুধু একটা ট্রেড্ল্ মেশিন নিয়ে উনি ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। নিজেই টাইপ বসাতেন, নিজেই মেশিন চালিয়ে ছাপাতেন। গত চল্লিশ বছরে আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রেসের চেহারা

অনেক বদলে গেছে। বর্তমানে, অক্ষয় বাবু বেশ কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক ছাপান। মাঝে মাঝে, দুটো একটা গল্প উপন্যাসের বই ছাপাবার অর্ডার পান। একটা ম্যাগাজিনও আছে। তাছাড়া, ছোট খাটো অর্ডার তো নিত্যদিনই লেগে আছে।

প্রেসের সোল প্রোপ্রাইটার হলেন অক্ষয় বাবু নিজে। ভাইপো পীযূষকে উনি ম্যানেজার বানিয়েছেন ; তাছাড়া, আরও দশ এগারো জন মানুষ প্রেসের কর্মী। পীযূষের কাকা, তাই প্রেসের সকলেই ওঁকে কাকাবাবু বলে ডাকে। চল্লিশ বছর আগে গোটা প্রেসটা ছিল একটা ঘরের মধ্যে, এখন বিরাট বাড়িটার গোটা একতলাটা জুড়ে প্রেস। বাড়িটা অক্ষয় বাবুর পৈত্রিক সম্পত্তি। উনি নিজে থাকেন দোতলায়। বীণাবাদিনী প্রকাশন ভবনে প্রত্যেক বছর ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো হয়। অক্ষয় বাবুর বিশ্বাস, 'বীণাবাদিনী' সরস্বতীর কৃপাতেই তাঁর এত বাড় বাড়ন্ত।

মানুষ হিসেবে অক্ষয়বাবু একেবারে সেকেলে। বর্তমান কালের সভ্যতা ওঁকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারে নি। উনি ধুতির নিচে সার্ট গুঁজে পরেন, এবং শীতকালে, তার উপর কোট। পায়ে ফিতেওয়ালা জুতো। এমন পোষাক বর্তমান যুগে বিশেষ চোখে পড়ে না।

অক্ষয়বাবুর স্ত্রী অর্চনাদেবী ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। উনি অক্ষয় বাবুর থেকে বয়সে অনেক ছোট। মনটাও অনেক বেশি আধুনিক।

কলকাতার একেবারে সাবেক বাসিন্দা যারা, অক্ষয় বাবুরা তাঁদেরই একজন। এককালে বৌবাজার অঞ্চলে ওঁদের জমিদার বলে খ্যাতি ছিল। বৌবাজারের বাড়িটা ওদের নিজস্ব, তার আশে পাশে বেশ কিছু জমিজমা এবং ঘর বাড়ি আশি নব্বই বছর আগে ওঁদেরই ছিল। বাড়িটা ছাড়া বাকি সবই পঞ্চাশ ষাট বছর আগে ওঁদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

অক্ষয় বাবুর সংসারে একটা বড়ো রকমের দুঃখের ইতিহাস আছে। প্রথমবার অক্ষয়বাবুর বিয়ে হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে। বিয়ের পর অনেক দেরিতে, প্রায় ছ'সাত বছর বাদে, ওঁর স্ত্রী সন্তান সম্ভবা হলেন। প্রসবের আগে জানা গেল, যমজ সন্তান হবে। এদিকে প্রসূতি যে ইতিমধ্যে 'জণ্ডিস্' রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তা ডাক্তারের নজর এড়িয়ে গেছে। প্রসবের ঠিক আগে অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হ'ল। সংগে সংগে মৃতদেহের পেট কেটে সন্তানদের বের করা হল। দেখা গেল, একটি ছেলে, একটি মেয়ে। মেয়েটি

ইতিমধ্যে মারা গেছে, কিন্তু ছেলেটির প্রাণ তখনও ধুক ধুক করছে। অক্ষয় বাবু চোখের জল চেপে, ছেলেকে বুকে করে বাড়ি ফিরে এলেন। ছেলের নাম রাখলেন, 'অশোক'।

বছর তিন চার কাটবার পর উনি বুঝলেন, মায়ের অভাব বাপকে দিয়ে পূরণ হয় না। উনি তখন আবার বিয়ে করলেন। দ্বিতীয় বিয়েতে অক্ষয় বাবুর আর ছেলেপুলে হল না। অশোককে নিয়ে স্বামী স্ত্রীর দিন কাটতে লাগল। অপরিমিত আদরে অশোকের লেখাপড়া বিশেষ হল না, কিন্তু সে বয়ে গেল না। অশোক প্রেসের কাজ শিখল এবং বাপকে প্রেসের কাজে সাহায্য করতে লাগল। অক্ষয়বাবু ছেলের বিয়ে দিলেন এবং বছর খানেকের মধ্যে নাতির মুখ দেখলেন।

কিন্তু ঈশ্বর অক্ষয়বাবুর প্রতি বিমুখ। বছর পাঁচেক আগে উনি স্ত্রী এবং নাতিকে নিয়ে হরিদ্বারে বেড়াতে গিয়েছিলেন, ছেলেকে রেখে গিয়েছিলেন প্রেসের কাজ সামলানোর জন্যে।

হঠাৎ একদিন ভাইপো পীযূষ এসে হাজির হল হরিদ্বারে। অক্ষয়বাবু জানলেন, অশোক এবং তার স্ত্রী দুজনেই হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ট্যাক্সি চেপে ওরা কালিঘাট যাচ্ছিল, একটা লরির সংগে ধাক্কা লেগে ট্যাক্সি উল্টে যায়। ড্রাইভার এবং যাত্রী দুজন, কেউই প্রাণে বাঁচে নি। অক্ষয়বাবুর চোখের সামনে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল, উনি পীযূষের সংগে কলকাতায় ফিরে এলেন। ক'দিন কান্নাকাটি, হাহুতাশ চলল। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অক্ষয়বাবু আবার বুক বাঁধলেন, কিন্তু স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে, নাতিকে আমি নিজের কাছে রাখতে চাই না, ওকে আমার বোনের কাছে কাশীতে পাঠিয়ে দাও।' অশোকের ছেলেকে কাশী পাঠানো হল। অক্ষয় বাবু নাতির খোঁজ খবর রাখতেন, খরচের জন্যে টাকা পয়সাও পাঠাতেন, কিন্তু কখনোই চোখে দেখতে চাইতেন না।

সরস্বতী পুজো উপলক্ষে সেদিন প্রেসের কর্মীরা এবং পাড়ার কয়েকটি পরিবার বীণাবাদিনী ভবনের ভিতরকার উঠোনে জমায়েত হয়েছে। গোটা উঠোনটা জুড়ে ফোলডিং চেয়ার পাতা। উঠোনের একদিকে বীণাবাদিনী সরস্বতীর মূর্তি, এবং তার পাশেই জলসার জন্যে স্টেজ বাঁধা হয়েছে।

পুজো সকালেই চুকে গেছে। খাওয়া দাওয়াও মিটে গেছে অনেকক্ষণ। জলসার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে সকলে।

সবচেয়ে বেশি অধৈর্য হয়েছেন অক্ষয়বাবু নিজে। তিনি একেবারে হাঁক ডাক লাগিয়ে দিলেন। গৌতমকে ডেকে বললেন, 'এই ছোকরা, দ্যাখো তো, পীযূষ কোথায় গেল ? জলসা আরম্ভ হতে এত দেরি হচ্ছে কেন ? দেখছ না, সবাই কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে !'

গৌতম মনে মনে বলল, 'কেউ ব্যস্ত হয় নি কাকাবাবু ; সবাই বসে, বসে, আড্ডা দিচ্ছে। আপনিই শুধু হই চই করছেন।' কিন্তু কাকাবাবুর মুখের উপর একথা বলা যায় না। গৌতম পীযূষের খোঁজে গেল।

পীযূষকে কিন্তু ঘরে পাওয়া গেল না। গৌতম এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সন্ধে নেমেছে, বাইরে আলোর রেশ থাকলেও ঘরগুলো একেবারে অন্ধকার। গৌতমের গা ছমছম করতে লাগল। পকেট থেকে দেশলাই বার করে, সে একটা কাঠি জ্বালাল। শেষ পর্যন্ত, একেবারে কোণের ঘরের বারান্দা থেকে পীযূষের সাড়া পাওয়া গেল। সে প্রেসের এক কর্মী রফিক আলির সংগে কথা বলছে। গৌতম তখন গলা উঁচু করে' ডাকল, 'পীযূষদা, শিগগির আসুন, কাকাবাবু আপনাকে ডাকছেন।'

পীযূষ এসে কাকাবাবুকে বোঝাল, সব ঠিকই আছে, সমস্যা একটাই, সেটা হল 'লোড শেডিং'। লোড শেডিং-এর উপর তো কারো হাত নেই। হ্যাজাক জ্বালিয়ে জলসা সুরু করা যায়, কিন্তু মাইক চলবে না। আজ কাল 'লোড শেডিং' বেশিক্ষণ থাকছে না, এখুনি আলো এসে যাবে। সুতরাং, জলসা সুরু করতে বেশি দেরি হবে না।

একেবারে সামনের সারিতে বসেছিলেন কাকাবাবু, এবং তাঁর পাশে কাকিমা এবং কমলিকা। মহিলা দুজনের বয়সের তফাৎ অনেক, কিন্তু মেয়েদের বন্ধুত্ব তাতে আটকায় না। কমলিকা প্রেসের এক কর্মী। তার বয়স সাতাশ -আঠাশ, বিবাহিত, আট বছরের একটি ছেলে আছে। আঠারো বছর বয়সে পাড়ার একটি ডেয়ার-ডেভিল ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। উনিশ বছরে বিয়ে হল, বিশ বছরে এক ছেলের মা। বর মণি দত্ত পলিটেকনিক ইন্‌স্‌-টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে কিছুদিন এদিক ওদিক শিক্ষানবিসি করেছে, তারপর গত সাত বছর ধরে আসানসোলের কাছে একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে। সে গড়পড়তা মাসে একবার কলকাতায় আসে। বছর তিনেক আগে প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে বি. এ. পাশ করেছে কমলিকা, তারপর থেকে কাকাবাবুর প্রেসে ওর চাকরি। কাশীতে স্থানান্তরিত নাতি এবং ভাইপো

পীযূষ ছাড়া কাকাবাবুর আর কেউ নেই, উনি কমলিকাকে প্রায় নিজের মেয়ের মতো ভালবাসেন।

কমলিকার নাক মুখ চোখ মোটামুটি, কিন্তু ওর মুখে এমন একটা আলগা শ্রী আছে যে সবারই ওকে ভাল লাগে। তবু কেন যেন ওর চোখে সব সময় একটা বিষাদের ছায়া! কাকিমা ভাবেন, ওর মুখের গড়নটাই বুঝি ঐ রকম। নইলে, কমলিকার আবার দুঃখ কিসের?

কাকিমা বললেন, 'কমল, যতক্ষণ না আলো ফিরে আসে, ততক্ষণ তুমিই একটা গাও না?'

কমলিকা জানাল, ছেলেবেলায় ও অল্প সল্প নাচ শিখত, কিন্তু গানের চর্চা কোনোকালেই করেনি। বিশেষ করে স্টেজে বসে গান করবার অভ্যেস একেবারে নেই। বলল, 'গান গাইতে বসে শুধু শুধু লোক হাসিয়ে লাভ কী? গৌতম গান জানে, গৌতমকে বলুন না!'

গৌতম গান জানে, শুনে কাকিমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। গৌতম পাশেই দাঁড়ানো, অগত্যা তিনি ওকেই গান গাইতে অনুরোধ জানালেন।

গৌতমকে গান গাইবার জন্যে দ্বিতীয়বার সাধতে হয় না। সে দ্রুতপায়ে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল। গৌতমের বাবা ছোট খাটো বিজনেস্ ম্যান, ব্যবসা সূত্রেই অক্ষয়বাবুর সংগে পরিচয়। গৌতমের চাকরিও সেই সুবাধে গৌতমের বয়স তেইশ-চব্বিশ, বেঁটে-খাটো, গোল-গাল, নাদুশ-নুদুশ চেহারা, পরনে ঢিলে প্যান্ট, আর বুস সার্ট। গলার থাকে থাকে তিন ভাঁজ চর্বি। ছেলেটি ভালোই, মনের মধ্যে কোনো ঘোর প্যাঁচ নেই, লেখাপড়ায় সাদামাঠা। ইনিয়ে বিনিয়ে রবীন্দ্র সংগীত গায়। গৌতমের গান কাকিমার একেবারে পছন্দ নয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি ওকেই গানের ফরমাস দিলেন।

ষ্টেজের উপর আলো কমে এসেছে, মাইকও চলছে না, কিন্তু গৌতমের উৎসাহের অভাব নেই। সেই ষ্টেজে উঠে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যাদিনে যাব গান' গানটি গাইতে আরম্ভ করল। গানটি যদিও ঠিক স্থান-কালের উপযোগী হল না, কিন্তু গৌতমের তাতে কিছু আসে যায় না। সে প্রাণ ঢেলে গাইতে লাগল। মুস্কিল হল, ওর সাধ যত, সাধ্য তত নয়। ওর একাগ্রতার কোনো অভাব নেই, কিন্তু গানের সুরের সংগে ওর গলার বিস্তর ফারাক। অধিকাংশ শ্রোতাই গৌতমের গানকে একেবারে অগ্রাহ্য করে, নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব চালিয়ে যেতে লাগল।

উপস্থিত জনতার মধ্যে একমাত্র আদর্শ শ্রোতা হলেন কাকাবাবু। তিনি চোখ বুজে একাগ্র মনে মাথা নেড়ে গানের সংগে সংগে তাল দিতে লাগলেন। ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হল, উনি গানটি খুবই উপভোগ করছেন। শ্রোতারা সকলে যদি কাকাবাবুর মতো হতেন, তবে গৌতমের মতো গায়কদের একটা হিল্লে হত।

কাকিমার কনুই-এর গুঁতো খেয়ে কাকাবাবুর ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি বিরক্ত চোখে একবার কাকিমার দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপরই তাঁর চোখে পড়ল, ষ্টেজের সামনে তিমির দাঁড়িয়ে। তিমিরকে দেখে উনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। কঠোর স্বরে বললেন, 'ঐ ছেলেটা ওখানে কী করছে?'

কাকিমা ইঙ্গিতে ওঁকে চুপ করতে বললেন। কিন্তু কাকাবাবু চুপ করবার পাত্র নন। গত বছর সরস্বতী পুজোর প্যাণ্ডেলে, ঐ লোকটিই নেচে নেচে 'ডিস্কো' গান গেয়ে গেছে, একথা উনি ভোলেন নি। উনি দৃঢ়স্বরে বললেন, 'ও কি আজ আবার গাইবে নাকি? ডাকো তো পীযূষকে।'

কাকিমা বললেন, 'তুমি চুপ করো না।'

কাকাবাবু বললেন, 'ও যদি আবার নাচ শুরু করে, তবে আমি পুলিশ ডাকবো। ষ্টেজের উপর দাঁড়িয়ে লাফালাফি করলেই নাচ হয় না। ওকে কে এখানে ঢুকতে দিল? গৌতমটা বোধহয়! ও যেন গৌতমের কে হয় না?'

কাকিমা অনেক কষ্টে কাকাবাবুকে চুপ করালেন। কাকাবাবু মুখে আর কিছু বললেন না, কিন্তু মনে মনে গজ গজ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে আলো ফিরে এল। জনতার মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল। এবং গৌতমের গলা জোরালো হয়ে সবার কানে পৌঁছল, কারণ আলো আসার সংগে সংগে মাইকেও আওয়াজ এসে গেছে।

এমন সময় শ্রোতাদের মধ্যে সবগুলি মুখ দরজার দিকে ফিরল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, আর্টিষ্ট এসে গেছে। সবাই চেয়ে দেখল, শুভজিৎ আসছে। তার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। মনে হল, সে যেন ভাসতে ভাসতে আসছে। তার পিছন পিছন এল বাবলু, হাতে এক জোড়া তবলা, তার পিছনে চন্দ্রানী, তানপুরা হাতে নিয়ে। শুভজিতের সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সকলের গুঞ্জন ধ্বনি থামল।

শুভজিৎকে আসতে দেখেই গৌতম গান থামিয়ে দিয়েছিল। তিমির ওদের তিনজনকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসতে সাহায্য করল। তিমির এবং

গৌতম মিলে শুভজিতের সামনে মাইক ঠিক করতে লাগল। কাকাবাবুর মাথা এতক্ষণে ঠাণ্ডা হল।

কাকিমা ফিস্‌ফিস্‌ করে কমলিকাকে বললেন, 'বাঃ, ছেলেটির চেহারাটি তো ভারী সুন্দর!' বলে' ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন। কমলিকা এতক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে শুভজিতের মুখের দিকে চেয়েছিল। কাকিমার মন্তব্যে ওর মুখটা লাল হয়ে উঠল। কাকিমা কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর আবার ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললেন, 'কি পছন্দ হয়ে গেল নাকি?' কমলিকার মুখের রং আরও গাঢ় হল, বলল, 'কি যা-তা বলছেন!' বলেই কাকিমার দিকে চেয়ে ফিক্‌ করে হেসে ফেলল। তারপর দুই মহিলা, একবার নিজেদের দিকে, একবার শুভজিতের দিকে, চেয়ে চেয়ে কিশোরী মেয়েদের মতো হাসাহাসি করতে লাগলেন।

কাকিমা বললেন, গৌতমের দাদাটা নিশ্চয় ঐ মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেছে।' কমলিকা জিগ্যেস করল, 'গৌতমের দাদা কে? ঐ দাড়িওয়ালা লোকটা?' কাকিমা উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ, দেখছ না, মেয়েটার গায়ের সংগে একেবারে সেঁটে গেছে!' কাকাবাবু চোখ পাকিয়ে নীরবে একবার ধমক দিলেন। কমলিকা একবার তিমিরের দিকে, একবার চন্দ্রানীর দিকে ফিরে চেয়ে দেখল, ভাবল, সত্যিই প্রেমে পড়েছে, না অন্য কোনো মতলব আছে?'

কাকাবাবু সিরিয়াস মানুষ, তিনি শুভজিতের বাজনা শোনবার জন্যে মনে মনে একাগ্র হবার চেষ্টা করছিলেন, পার্শ্ববর্তী দুটি নারীর উচ্ছলতায় বারবার ওঁর মনের একাগ্রতা নষ্ট হচ্ছিল। উনি ওদের দিকে ফিরে আবার ধমক দিয়ে বললেন, 'কী হচ্ছে?' কাকিমা আর কমলিকা হাসি হাসি মুখে মুখ টিপে বসে' রইলেন। ওদিকে স্টেজের উপর চন্দ্রানী তানপুরাতে আঙুল ছোঁয়াতে লাগল, অকারণে চন্দ্রানীর গা ঘেঁষে স্টেজে উপর বসে রইল তিমির, তবলার উপর হাত দুটো ঠেকিয়ে রেখে নিশ্চল হয়ে বসে রইল বাবলু, এবং শুভজিৎ দরবারি কানাড়ার আলাপ শুরু করল।

দরবারি কানাড়ার মধুর গম্ভীর সুরে প্রত্যেকটি মানুষ ভেসে যেতে থাকল, কিন্তু কমলিকা উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। তার আর বসে' থাকবার জো নেই। মণি আজ ভোরে আসানসোল থেকে এসেছে। ছেলেটাও সারা দিন একলা রয়েছে। আজ ছুটির দিন; ছুটির দিনে সাধারণত ও ঘরের অনেক

কাজ গুছিয়ে রাখে। কিন্তু, সরস্বতী পুজো উপলক্ষে আজ সকাল থেকেই ও ঘরের বাইরে, শ্বাশুড়ি এতক্ষণে নিশ্চয়ই রেগে আগুন হয়ে আছেন। এদিকে এমন একটা গানের আসর ছেড়ে অসময়ে উঠে যেতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। কমলিকা একবার কাকিমার দিকে, একবার শুভজিতের দিকে, একবার নিজের হাতঘড়ির দিকে, চেয়ে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। কাকিমা বললেন, 'শেষ পর্যন্ত থেকে যাও, আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।' কমলিকা ম্লান হেসে বলল, 'তাহলে সর্বনাশ হবে। আমি চলি।'

কমলিকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগোল। ওর মনে হল, বাজনাটা যেন ওকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওর পিছন পিছন এগিয়ে আসছে। ও একবার ফিরে তাকাল ষ্টেজের দিকে, দেখল, শুভজিৎ বাজনার মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি অন্যমনস্ক, কিন্তু শুভজিতের চোখ দুটি যেন ওরই দিকে চেয়ে রয়েছে। কমলিকা চোখ নামিয়ে মেজের দিকে চাইল। দোরের দিকে এগিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু কিসে যেন ওর পা দুটিকে মাটির সংগে আটকে রেখেছে। চোরা চাউনিতে আবার ষ্টেজের দিকে ফিরে চাইল কমলিকা। দেখল, শুভজিতের চোখের দৃষ্টি ওর মুখের উপর পড়ে' নিশ্চল হয়ে গেছে। কমলিকার মনে হল, এতগুলি শ্রোতা বসে রয়েছে, এদের উপস্থিতি যেন শুভজিতের কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে; মনে হল, সে যেন সংগীতের সমস্ত অর্ঘটা কমলিকাকে উদ্দেশ্য করেই রচনা করে চলেছে। এতক্ষণ কান পেতে বাজনাটাই শুনছিল কমলিকা, এখন সংগীতের স্রষ্টার প্রতি ওর চিত্ত একটু একটু করে' উন্মুখ হল। শুভজিতের সংগীত ওর বুকের ভিতর গুরু গুরু বাজতে লাগল, আবার মুখ নিচু করে' মেজের দিকে চাইল ও, আর একবার ফিরে চাইল ষ্টেজের দিকে, তারপর এক-পা একপা করে এগিয়ে গেল গেটের অভিমুখে।

তিন

বাড়ি ফিরে কমল দেখল, শ্বাশুড়ি রান্নাঘরের সামনে বসে' তরকারি কুটছেন এবং মনে মনে গজ গজ করছেন। শুনল, মণি ছেলেকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে, তখনও ফেরেনি। শ্বাশুড়ি বিরক্ত মুখে বললেন, 'আজ

ছুটির দিনটাও তুমি সারাদিন বাড়ি নেই। বিশেষ করে' মণি এখন কলকাতায়। আমি আর কত দিক সামলাই। ওঁর হাঁপানির টানটাও আবার বেড়েছে।'

কমলিকা এসব কথার প্রতিবাদ না করে' নিজের কাজে লেগে গেল। ষ্টোভে একটু দুধ গরম করে নিল, তারপর একটা রুটি ছিঁড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে' ওর মধ্যে ফেলল, শিশি থেকে চার চামচে চিনি ঢেলে দিল বাটির ভিতর। তারপর বাটিটা হাতে নিয়ে দ্রুতপায়ে শ্বশুরের ঘরের দিকে গেল।

শ্বশুর রুদ্রপ্রসাদ সাধারণত অনেক ভোরে ওঠেন, মুখ হাত ধুয়ে বাজারের টাকা নিয়ে বেরিয়ে যান সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। ঘণ্টা দুয়েক রাস্তায় পায়চারি করে' বাজার টাজার সেরে ফেরেন সাড়ে সাতটা নাগাদ। আগের আমলের বি, এ, পাশ। পাশ করে' একটা সামান্য কেরানীগিরি করে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। যথেষ্ট গুণ ছিল, ক্ষমতাও ছিল, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা একেবারেই ছিল না।

কমলিকা ভাবে, শ্বশুর লোকটি মন্দ নন—ওকে মোটামুটি পছন্দই করেন। গতমাসের শেষে মাইনে পেয়ে কমলিকা যখন ওঁর জন্যে এক-জোড়া ধুতি কিনে এনেছিল, খুব খুশি হয়েছিলেন। বাজার থেকে ফিরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘণ্টা দেড়েক ধরে' খবরের কাগজ পড়েন। তারপর বারোটা নাগাদ খাওয়া দাওয়া সেরে' ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে নেন। পাড়ার অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধদের একটা তাসের আড্ডা আছে, বিকেলের দিকে উনি সেখানে যান। কয়েকঘণ্টা বাদে ফিরে রাতের খাওয়া সেরে' দশটার মধ্যে বিছানায় চলে যান। বছর ছয়েক আগে, রিটায়ার করবার পর থেকে, এই মোটামুটি ওঁর দৈনন্দিন রুটিন। শ্বশুরকে কমলিকা মনে মনে পছন্দই করে। কয়েক বছর ধরে' হাঁপানিতে ভুগছেন। মাঝে মাঝে ভাল থাকেন, মাঝে মাঝে কষ্টটা বাড়ে। আজ বোধহয় আবার বেড়েছে।

কমলিকা চামচে দিয়ে শ্বশুরকে খাবারটা খাওয়াতে লাগল। যতক্ষণ ও ওঁকে রুটি আর দুধ খাওয়াতে লাগল, ততক্ষণই উনি কৃতজ্ঞচিত্তে ওকে অনেক আশীর্বাদ জানালেন। কমলিকা জানে, যখন ওঁর হাঁপানির টান বাড়ে, তখন ওঁকে প্রায় শিশুর মতো যত্ন করতে হয়। তাতে ওঁর দেহ এবং মন দুইই একটু সুস্থ হয়।

শ্বশুরকে খাইয়ে ও নিজের ঘরে ফিরে এল। দরবারি কানাড়ার সুরটা তখনও ওর কানের মধ্যে রিন্ রিন্ করে' বাজছিল। হঠাৎ মিঠুর গলার আওয়াজ ওর কানে এল। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, মণি নেই। মিঠুকে দরজার সামনে নামিয়ে দিয়েই কোথায় চলে গেছে। মণি যখনই কলকাতায় আসে, তখনই এমনি। রাতে শুতে আসা ছাড়া, ঘরের সংগে ওর আর কোনো সম্পর্ক নেই। সারাটা দিন পুরনো বন্ধুদের সংগে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।

মিঠু ওর মাকে দেখতে পেয়ে বেজায় খুশি। সারাদিন প্যাণ্ডেলে-প্যাণ্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়িয়েছে, সেই সব গল্প ওর পেটের মধ্যে গজ গজ করছিল।

মিঠুর বয়েস আট, ক্লাশ থ্রি-তে পড়ে। ছেলেটা বয়েস আন্দাজে যথেষ্ট বুদ্ধিমান, লেখাপড়ায় বেশ ভালো। গানের দিকেও ঝোঁক আছে, বিশেষ করে' বাজনার দিকে। একদিন একটা সেতারের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিঠু হঠাৎ বলেছিল, 'মা, একটা সেতার কিনবে?' ঐটুকু ছেলে, সেতারের শখ দেখে অবাক হয়েছিল কমল। জিগ্যেস করেছিল, 'সেতার নিয়ে করবি?' মিঠু উত্তরে বলেছিল, 'কেন, বাজাতে শিখবো। সেদিন অনিন্দ্যদের বাড়ি গিয়েছিলাম, ওর দাদা সেতার বাজায়। আমি গেলে আমাকেও বাজাতে দেয়। জানো, আমি সা-রে-গা-মা বাজাতে জানি।' কমল ভাবল, একটা সেতার কিনে দিতে হবে ছেলেকে। ছেলেবেলায় কমলেরও গান বাজনার শখ ছিল। কিন্তু শেখবার সুযোগ ঘটে নি। শিখতে গেলে সময় খরচ, টাকা খরচ। পাড়াতে অবৈতনিক এক নাচের মাণ্টার জুটে গিয়েছিল, তাই কিছুটা নাচ শেখবার সুযোগ পেয়েছে। বাবা সারাদিন অফিস এবং টিউশানি করেও ভালো করে সংসার চালাতে পারতেন না। কণ্ট যতই হোক, বাবা তো তবু তাকে স্কুলফাইনাল পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন। কলেজে ভর্তিও হয়েছিল কমল। কলেজে পড়তে পড়তে মণি দত্তের সংগে ভাব হল, ঘনিষ্ঠতা হল, ধাঁ করে' বিয়ে হয়ে গেল। বাবা-মা হাতে একেবারে চাঁদ পেলেন। মণি তখন পলিটেকনিক থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে সবে সামান্য একটা ট্রেনিং-এর কাজে জয়েন করেছে। সে কাজটা মণি অবশ্য বেশি দিন করে নি। সাত বছর আগে আসানসোলের চাকরিটা পেয়ে গেল। মণি লেখাপড়ায় মন্দ নয়, কিন্তু কমলিকার মতো ফাইন আর্টস্-এর দিকে কোনো

ঝোঁক নেই। কলকাতায় থাকতে সারাদিন পাড়ার ছেলেদের উপর মাতব্বরি করে' বেড়াত। মিঠু বাপের বুদ্ধি পেয়েছে, আর পেয়েছে মায়ের অন্তর্মুখী মন। ছবি আঁকবার হাত বেশ ভালো ইতিমধ্যেই। খেলাধুলোয় বিশেষ মন নেই। কমল ভাবে, সত্যিই একটা সেতার কিনে দিতে হবে ছেলেকে। ভাল একজন সেতারের মাষ্টারও যোগাড় করতে হবে। সেতারের মাষ্টারের কথা মনে হতে, শুভজিৎকে মনে পড়ল আবার, মুখটা অকারণেই লাল হয়ে উঠল কমলের। কি সুন্দর বাজায়! মিঠুকে সেতার শেখাতেই হবে, যে ভাবেই হোক।

যতদিন শুধু মণির রোজগারে সংসার চলেছে, ততদিন যথেষ্ট অভাব ছিল। এখন কমল নিজেও চাকরি করে। ও নিশ্চয়ই ছেলেকে কিনে দেবে একটা সেতার। একটা ভাল সেতার কিনতে গেলে হয়তো পাঁচ ছ'শো বেরিয়ে যাবে। মণি হয়তো বিরক্ত হবে, কিন্তু, এ খরচ তো প্রয়োজনের জন্যে খরচ, শখের জন্যে নয়। ও-তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো মাসে দশ-বারোটা সিনেমা দেখে পয়সা নষ্ট করে না। ছেলের যখন এদিকে ঝোঁক আছে, তখন তাকে সুযোগ দেওয়া মা হিসেবে ওর কর্তব্য।

মিঠু মায়ের হাত ধরে' টানতে টানতে দাদুর ঘরের দিকে গেল। কোনো নতুন অভিজ্ঞতার কথা দাদুকে না শোনানো পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। দাদুর কাছে গিয়ে বলে উঠল মিঠু, 'জানো দাদু, বিডন ষ্ট্রীটের সরস্বতী ঠাকুরের চুলে-না মেয়েদের মতো বব্ ছাঁট। বাবা বলছিল, দারুন সাজিয়েছে।'

দাদু তখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ। তাঁর মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'ভালই তো! সামনের বছর হয়তো ঠাকুরকে ওরা বেল বটম পরিয়ে দেবে।'

দাদুর রসিকতাটা মিঠু ঠিক উপলব্ধি করতে পারল না। কমলিকা খিল খিল করে হেসে উঠল। মিঠু মুহূর্তের মধ্যে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল, 'আর বৌবাজারের ঠাকুরের ময়ূরটা-না পেখম মেলে উড়ছে।' কৃত্রিম কোপে চোখ পাকিয়ে কমলিকা বলল, 'দূর বোকা, সরস্বতী ঠাকুরের ময়ূর থাকে নাকি!'

মিঠু তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে' বলে উঠল, 'না না, হাঁস, হাঁস! হাঁসটা-না পেখম মেলে উড়ছে!' হাঁসের পেখম শুনে রুদ্রপ্রসাদ এবং কমলিকা আবার এক সংগে হেসে উঠলেন।

মিঠু বুঝল, আবার বোধহয় কোথাও সে ঠাকুর সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করে ফেলেছে, তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'দাদু, চকোলেট খাবে?' কমলিকা ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'তোকে আমি পই পই করে চকোলেট খেতে বারণ করে দিয়েছি না?'

মিঠু কাচু মাচু মুখে উত্তর করল, 'বাবা কিনে দিল যে!'

কমলিকা বিরক্ত স্বরে বলল, 'তোর ইচ্ছে ছিল না, বাবা অমনি অমনি তোকে কিনে দিয়েছে! পাজি ছেলে কোথাকার! দে, চকোলেটগুলো আমায় দে।' বলে নিজেই মিঠুর পকেটে হাত ঢোকাল।

মণির অপেক্ষায় বসে' থাকতে থাকতে ঘুমে ঢুলছিল কমলিকা। মিঠু অনেকক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল কমল, সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। আটটার সময় মিঠুকে নামিয়ে দিয়ে গেছে মণি, ফিরল প্রায় বারোটায়। হয়তো তাসের আড্ডায় বসে গিয়েছিল। একটু বিরক্ত হ'ল কমল। শ্বাশুড়িও ছেলে ফিরবে বলে না খেয়ে বসে আছেন। শ্বশুরও হয়তো ওর জন্য অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। সরস্বতী পুজোর প্যাণ্ডেলে সারাদিন কমলেরও যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। মণি এসব ভাবে না। এসব ছোটো খাটো সামান্য জিনিস কখনো চোখে পড়ে না মণির। ওর সামান্য তাস খেলার আনন্দের জন্যে তিনটে লোক রাত জেগে বসে অপেক্ষা করছে, অন্তত জেগে থাকবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, এসব মণি কখনো খেয়ালও করে না।

কমল এগিয়ে এসে সদর দরজা খুলে দিল। মণি বেশ খুশ মেজাজে ঘরে ঢুকল। জিগ্যেস করল, 'বাবা কি এখনও জেগে আছেন নাকি?' কমল বলল, 'আমি জানি না। আমি ও ঘরে যাই নি।' মণি বাপের ঘরে উঁকি মেরে দেখল, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। রান্নাঘরে ঢুকে দেখল, মাও ঢুলছেন। মাকে ডেকে বলল, মা, অনেক দেরি হয়ে গেল। খেতে দাও। তোমরাও তাড়াতাড়ি সেরে নাও। রাত প্রায় বারোটা বাজে।'

মা বললেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এত রাত হল? বসে থাকতে থাকতে আমার চোখ জড়িয়ে এসেছিল।'

মনি বলল, 'অরূপ আর রতনের সংগে নাইট শোতে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। দাও, খেতে দাও। খিদেয় পেট জ্বলছে।'

রাতের খাওয়া সেরে পরদিন সকালের জন্যে উনুনটা তৈরি করে, কমল যখন নিজের ঘরে এল, তখন প্রায় রাত সাড়ে বারোটা বাজে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। কমল ভাবল, এতদিন বাদে স্বামী এসেছে, এখনি কি সে ঘুমুতে পারবে ?

রাতের পোষাক পরে বিছানায় উঠে কমল জিগ্যেস করল, 'সিনেমা কেমন দেখলে ?'

মণি বলল, 'ভালই। সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'। মন্দ করে নি।'

'চারুলতা' শুনে কমলের বুকের মধ্যে ধক করে' উঠল। বেশ কয়েকটা সিনেমা হাউসে 'চারুলতা' দেখানো হচ্ছে, কাকিমা কাল দেখে এসেছেন। আজ সকালেই কাকিমার সংগে কথা বলার সময় 'চারুলতা'র প্রসঙ্গ উঠেছিল, এখনও আবার চারুলতা ! এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিল, চারুলতার প্রসঙ্গে যে কথা সকালে মনে হয়েছিল, অনিবার্যভাবে আবার তা মনে পড়ল কমলের। মনে হল, চারুলতার স্বামীর সংগে কি ওর স্বামীর কোনো মিল আছে ? মানুষ হিসেবে দুজনে একেবারে আলাদা, কিন্তু মিল আছে বৈকি ! স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা নেই, তা নয়, কিন্তু স্ত্রীর মনের ভিতর কিসের আলোড়ন চলছে, স্ত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, চারুলতার স্বামীরও জানা ছিল না, মণিরও জানা নেই।'

'কমলের মন একটু বিষণ্ণ হল। যে ভাবনাটাকে ও মনে আনতে চায় না, ঘটনার গতি কেন বারবার ওর মনটাকে সেদিকে টেনে নিয়ে যায় ?

হঠাৎ মণি বলে উঠল, 'আমার অবশ্য এ ধরনের বই ভালো লাগে না। বাস্তব জীবনে নানা ধরনের কষ্ট সবসময়ই আছে ; একমাস, দু'মাস অন্তর একটা ছবি দেখবো, তাতে যদি আনন্দ না পাওয়া যায়, তবে ছবি দেখে লাভ কী ?'

কমল নিস্তব্ধ হয়ে রইল। কমল জানেনা, এ কথার কী উত্তর। 'আনন্দ' বলতে মণি কী বোঝে, তা জিগ্যেস করতে ভরসা হল না ওর। কী জানি, হয়তো মণির উত্তরেও আঘাতই পাবে। হঠাৎ কমলের মনে হল, মণি কি জানে, চারুলতা 'নষ্টনীড়ে'র চিত্ররূপ ? 'নষ্টনীড়' যে রবীন্দ্রনাথের রচনা, সে কথা কি মণি জানে ? ও কি 'নষ্টনীড়' পড়েছে ?

কমল মুখ ফুটে এসব কথা মণিকে জিগ্যেস করতে পারল না। নিস্তব্ধ হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল সে।

হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে যেতে ঘরের দিকে চোখ ফেরালো কমল, দেখল, ঘুমন্ত মিঠুর সংগে খুনসুঁড়ি করছে মনি। কমলিকার রাগ হল, সারাদিন প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঘুরে বেচারা ছেলেটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, এখন তাকে জাগানোর কোনো মানে হয়? ও ধমকে উঠল, 'কি, হচ্ছে কি, ছেলেটাকে বিরক্ত করছ কেন?'

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওকে সেতার শেখাবার কথা আবার মনে পড়ে গেল কমলের। ও বলল, 'মিঠুকে আমি সেতার শেখাবো।'

মণিদের বাড়িতে নাচ গান বাজনা ইত্যাদিকে মেয়েলি ব্যাপার বলে মনে করা হয়। কমলিকা নাচ জানে, তা নিয়ে মণি মাঝে মাঝে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। কমলের কথায় মণি হো হো করে' হেসে উঠল, বলল, 'তার থেকে বলো না কেন, ওকে নাচ শেখাবে। বড়ো বড়ো চুল রেখে যাত্রার দলের সখিদের মতো ধেই ধেই করে ছেলেটা নেচে বেড়াক।'

কমলিকা নিজেও ছেলে বেলায় নাচ শিখেছিল। এখনও মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে ও নাচের প্র্যাকটিস করে। স্বামীর মন্তব্যে ওর অপমান বোধ হল। বলে উঠল, 'শেখাবোই তো। ও নাচ গান বাজনা সবই শিখবে।'

মণি কিছুক্ষণ কমলিকার মুখের পানে চেয়ে রইল, তারপর দৃঢ় স্বরে বলল, 'না, আমার ছেলে মেয়েদের মতো বড়ো বড়ো চুল রেখে নাচ-গান-বাজনা কিছুই শিখবে না। লেখাপড়া শিখবে। যদি ফুটবল, ক্রিকেট শেখাতে চাও, আমার তাতে আপত্তি নেই।'

কমলিকা প্রতিবাদ করে' বলল, 'আমার একটা ছেলে। তুমি এখানে থাকো না। কোনো কাজে যদি আটকে না রাখা যায়, তবে পাড়ার বেয়াড়া ছেলেদের সংগে মিশে ও বয়ে' যাবে। তা আমি হতে দেব না। আমি ওকে সেতার শেখাবোই। নইলে আজে বাজে ছেলেদের সংগে মিশে ও অসভ্য হয়ে যাবে।'

কথাটা মণির গায়ে লাগল। সে ও ছেলে বেলা থেকে পাড়ার ছেলেদের সংগে মিশে তাদের ওপর মোড়লি করে' বড়ো হয়েছে। ওর মনে হল, কমলিকা যেন ওর 'কালচার' নিয়ে খোঁটা দিচ্ছে। ও রাগের মাথায় বলে উঠল, 'বেশ করবে, ও পাড়ার ছেলেদের সংগে মিশবে। ওদের সংগে মিশেই ও বড়ো হবে। আমি ওকে নাচ গান শেখাতে দেব না।' বলে উত্তেজিত

ভাবে একটা সিগারেট ধরাল মণি।

কমলিকার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সিগারেটের গন্ধ তার কোনো কালে সহ্য হয় না। ওর বাবা, দাদা কেউই সিগারেট খেতেন না। ও চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমাকে কতদিন বলেছি না, ঘরের মধ্যে সিগারেট খাবে না!'

মণি এ কথার প্রতিবাদে কিছু বলল না, সিগারেট হাতে নিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

কমলিকা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে' রইল। ও জানে, মণি সিগারেট খেতে ভালবাসে। মণি তো সাধারণত' ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। ওর ও উচিত নয়, মণির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গিয়েছিল, আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল, 'আমি ওর জন্যে সেতারের মাষ্টার ঠিক করে' রেখেছি।'

মণি আবার হো হো হেসে উঠল, বলল, 'কে তোমার মাথায় এসব উল্টো-পাল্টা আইডিয়া ঢুকিয়েছে? ও লেখাপড়া শিখে বড় হোক। খেলাধুলো করতে চায়, করুক। গান বাজনা শিখিয়ে লাভ কী? একগাদা খরচ ও হবে। তাছাড়া, আমার ছেলে ইনিয়ে, বিনিয়ে, রবীন্দ্রসংগীত গাইছে, অথবা যন্ত্র নিয়ে টুং-টুং করছে, এ আমার পছন্দ নয়।'

কমলিকার মাথা আবার গরম হল, ও জ্বলন্ত চোখে মণির দিকে চাইল, তারপর বলল, 'ও আমার ছেলে। আমি ওর মা। আমি যা বলব, তাই হবে।'

মণির চোখ দুটো ঝকঝকে করে উঠল, সে কমলিকার চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি ওর মা, কিন্তু আমি ওর বাবা। তুমি যা বলবে, তা হবে না, আমি যা বলব, তাই হবে।'

প্রচণ্ড ক্রোধে কমলিকা এবার জ্ঞান হারাল। এই পিতৃপ্রধান সমাজে মেয়েদের কথার কি কোনো দাম নেই? বাপ যদি ভুল ও করে, তবু এই সমাজে বাপের কথাই মেনে চলতে হবে? সে দৃঢ় স্বরে কেটে কেটে বলে' উঠল, 'তুমি যে বাপ, তার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু আমি যে মা, তা বিশ্ব শুদ্ধ লোক জানে।'

মুহূর্তের মধ্যে মণির মাথায় রক্ত চড়ে গেল, সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী, কী, বললে?'

কমলিকা বিচলিত না হয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, 'যা বলেছি, ঠিক বলেছি।

তুমি যে বাপ তার প্রমাণ নেই। কিন্তু আমি যে মা, তা কাউকে বলে দেবার দরকার নেই।'

প্রচণ্ড রাগে মণি একেবা'র দিশেহারা হয়ে' গেল, সে মুখের সিগারেটটা সজোরে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'কী বললে? যত বড়ো মুখ নয়, তত বড়ো কথা?'

উত্তেজনায় ওর শরীর কাঁপছিল, ঘরের মধ্যে গিয়ে আবার একটা সিগারেট হাতে নিয়ে বাইরে এল মণি। এমন কথা কমল ওকে বলল কী ভাবে? ও চিৎকার করে উঠল, 'আর কখনও যদি এ কথা শুনি তো, ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেবো।'

কমলিকা কঠিন স্বরে উত্তর করল, 'ঘাড় ধরে বার করে দেবার সাহস তোমার নেই। মনে রেখো, তোমার ছেলেকে আমি মানুষ করছি। তোমার বাপ মাকে ও আমিই প্রতিপালন করছি। কটা টাকা পাঠিয়ে তুমি সাহায্য করো, শুনি?'

কথাটা, সম্পূর্ণ না হলেও, আংশিক সত্য, সুতরাং মণির গায়ে লাগল। মণির মুখে আর কথা জোগাল না, ওর পৌরুষের দম্ভের গালে যেন ঠাস্ করে একটা চড় পড়ল। এমন সময় ও পাশের ঘর থেকে মায়ের ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বৌমা, তোমরা আর কতক্ষণ তর্কাতর্কি করবে? এবার শুতে যাও।' মণি আর কথা বাড়াল না, সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কত কথা যে কমলিকার মনে এল, তা বলবার নয়। কেন এমন হল? আজ ন' বছর হল, ওদের বিয়ে হয়েছে, ঝগড়া, বিবাদ, কথা বন্ধ, এ সব তো কতবারই হয়েছে, কিন্তু এমন কঠিন কথা তো ওর মুখ থেকে আগে কখনও বেরোয় নি! কমলিকা ভেবে দেখল, আগেকার ঝগড়া বিবাদের মূলে ছিল অভিমান, কিন্তু এবার তা নয়। ব্যক্তি হিসেবে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এমন শক্ত কথা বলতে বাধ্য হয়েছে কমলিকা। একবার মনে হল, মণি যে ওর দুঃখ বেদনার কথা বিশেষ ভাবে না, সে তো হৃদয়হীনতার জন্যে নয়, ওর স্বভাবটাই ঐ রকম। স্ত্রীপুত্রের প্রতি যে স্বাভাবিক ভালবাসা অধিকাংশ লোকের থাকে, মণিও তাদের থেকে ব্যতিক্রম নয়। কমলিকা ভেবে দেখল, একটা মানুষের মনের মধ্যেই কত রকমের বিরুদ্ধ মতের সমাবেশ হয়, তার ঠিক নেই; এতো দুটো

মানুষ! দুটো বিরুদ্ধ চিন্তাধারার মধ্যে মাঝে মাঝে যে সংঘাত হবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী? মণি তো ওর স্বাধীনতায় পারত পক্ষে হস্ত ক্ষেপ করে না। পরক্ষণেই মনে হল, না, না, তা নয়! ব্যক্তি হিসেবে কমলিকার প্রতি ওর শ্রদ্ধা আছে, তাই মণি ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না, এ কথা মোটেই ঠিক নয়। কখনোই হস্তক্ষেপ করবার দরকার হয় নি, তাই করে নি। যে মুহূর্তে দুটো সত্তা আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, অমনি যুক্তি, বুদ্ধি, ভালোবাসা এবং বিবেচনাবোধকে অতিক্রম করে ওর পৌরুষের অভিমান মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মিঠুর কথা, মিঠুর বাজনার কথা, শুভজিতের কথা, কত কথাই যে ওর মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল, তা বলবার নয়, কিন্তু মণিকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে নিজের সম্পূর্ণ আলাদা অস্তিত্বের কথাও সে ভাবতে পারল না।

কিছুক্ষণ বাদে ঘরের ভিতর ফিরে এল কমল, মণির বুকে একটা হাত রেখে, বলল, 'এই, রাগ কোরো না। আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

এ কথার উত্তরে কমলের হাতটাকে এক ঝটকায় দূরে ঠেলে দিয়ে পাশ ফিরে শুল মণি। একই শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে রইল দুজনে। কমলিকার মনে হল, কে যেন ওদের মাঝখানে একটা অদৃশ্য দেয়াল গেঁথে দিয়েছে। দেয়ালটাকে অতিক্রম করে সে রাত্রে কিছুতেই আর সে মণির কাছে পৌঁছতে পারল না। কিছুক্ষণ বাদে ও অনুভব করল, মণির নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে। টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল কমলিকার দু চোখ বেয়ে।

চার

ক্রিং ক্রিং করে ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে অ্যালার্ম বন্ধ করে কমলিকা আবার পাশ ফিরে শুলো। চোখে অতৃপ্ত ঘুম, শরীরের ক্লান্তি তখনও দূর হয়নি। কিন্তু কোনো উপায় নেই, আরও মিনিট পাঁচেক এপাশ ওপাশ করে কমলিকা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বিছানার অন্যপ্রান্তে জড়োসড়ো হয়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে মিঠু, এখনও তার ঘুম ভাঙেনি। কমল

ভাবে, আহা, বেচারা আরও আধ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিক।

সাড়ে ছটা বেজে গেল। কমল রান্নাঘরে ঢুকে উনুনে আগুন দিল। ভিজে কয়লা, সহজে আগুন ধরতে চায় না; পাখার হাওয়া দিয়ে, ফুঁ দিয়ে অনেক কষ্টে ধরালো। উনুনের পিছনে দশ মিনিট সময় বেশি খরচ হল, কমল ভাবে। সকালের দিকে, হাতে একেবারে মাপা সময়। একটু এদিক-ওদিক হলেই অফিসে পোঁছতে দেরি হয়ে যাবে। কমলের ইচ্ছে ছিল, গ্যাসের উনুন কিনবে। কিন্তু শ্বাশুড়ির ভয়, অন্যমনস্ক হয়ে কেউ যদি গ্যাস খুলে রাখে, তাহলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে সব সময়। রাস্তায় বেরোলে গাড়ি চাপা পড়তে পারে মানুষ। সিলিং থেকে পাখা খুলে পড়ে মারা যেতে পারে, কত কীই তো ঘটতে পারে! তাই বলে, সভ্যতা আমাদের হাতে যে সব সুবিধে তুলে দিয়েছে, সেগুলো কি আমরা ব্যবহার করব না? তা হলে প্রাচীন যুগের মতো বনে গিয়ে বাস করলেই তো হয়।

অসন্তুষ্ট মনে রান্নাঘর থেকে বেরোল কমল। দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। ঝি এসেছে নিশ্চয়। কমল দরজা খুলে দিয়ে রাতের নোংরা বাসন বের করে দিল। চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে ঢুকল বাথরুমে। বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে আছাড় খেতে খেতে সামলালো অনেক কষ্টে। আবার শ্যাওলা জমেছে। রবিবার আবার সোডা সাবান দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। রবিবার ছাড়া অন্য দিন তো নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাওয়া যায় না। দু'ঘটি জল মাথায় ঢেলে কোনো মতে স্নান সেরে নিল কমল। চা বানিয়ে সকলের জন্যে জল খাবার তৈরি করে' কমল গেল মিঠুকে ঘুম থেকে তুলে দিতে। যদিও মণির সংগে এবার ওর মত-বিরোধ চরমে উঠেছিল, কিন্তু, আসলে মণির প্রতি ওর কোনো রাগ নেই। শ্বশুর সাদামাটা ভালমানুষ গোছের লোক, তাকেও মনে মনে পছন্দই করে কমলিকা। মণির একটা ছোট বোন আছে, দু বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে। সম্পর্কে যদিও ননদ, কিন্তু তার সংগে কমলের কখনো ঝগড়া বিবাদ হয় নি।

বাড়ির মধ্যে একমাত্র গোলমেলে মানুষ হলেন শ্বাশুড়ি। স্কুল কলেজে লেখাপড়া করেছেন, কিন্তু মনটা যেমন অনুদার, তেমনি গ্রাম্য। কমলের কাজের আর ব্যবহারের খুঁত ধরবার চেষ্টা করাই ওঁর সারাদিনের কাজ। সকালে বিরক্ত মুখে ঘুম থেকে ওঠেন, তারপর মুখ হাত ধুয়ে, কাপড়

ছেড়ে, ঢোকেন পুজোর ঘরে। সেখানে ঘণ্টা খানেক পুজোর ভড়ং চলে। উনি পুজোর ঘর থেকে বেরোনোর আগেই কমল রান্না শেষ করে' ফেলবার চেষ্টা করে। যদি না পারে, শ্বাশুড়ির কাছে খোঁটা শুনতে হয়।

মিঠুর জলখাবারের ব্যবস্থা করে কমল তাড়াতাড়ি রান্না চাপায়। শ্বশুর অন্য দিনের তুলনায় বেশ ভালো আছেন। সকালে উঠে বাজারে গিয়েছিলেন, এখন ফিরেছেন। ঝি মাছ তরকারি কেটে দিয়ে গেছে। সকালে রান্নার ঝামেলা কম। ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, আর একটা ভাজা বা তরকারি। নটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। শেষ করতেই হয়, নইলে অফিসে পেঁছিতে দেরি হয়ে যায়। তার আগে আবার স্কুলে পেঁছে দিয়ে যেতে হয় মিঠুকে। মিঠুর স্কুল নিয়েও কমলকে খোঁটা শুনতে হয়েছে শ্বাশুড়ির কাছে। মিঠুকে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করেছে ও। পাড়াতেও একটা স্কুল আছে, কিন্তু সেটা প্রায় গোরুর গোয়ালের সামিল। শ্বাশুড়ির মতে, দূরের স্কুলে ছেলেকে পড়তে পাঠানো এক ধরনের বিলাসিতা। কমলের এসব গা-সহা হয়ে গেছে, আর গ্রাহ্য করে না। বিয়ের পর প্রথম প্রথম মনে কষ্ট হত খুব, মণিকে বললে সে ভাল করে' বুঝতো না, বোধহয় ভাবত, বৌ মাকে দেখতে পারে না। আজকাল কমল আর বিশেষ প্রতিবাদ ও করে না, গ্রাহ্যও করে না। শ্বাশুড়ি যা বলেন, এ কান দিয়ে শুনে, ও কান দিয়ে বের করে দেয়।

রান্না শেষ করে মিঠুকে ভাত বেড়ে দিয়ে নিজে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল কমলিকা। কোনো কোনো খাবার মিঠুকে খাইয়ে দিতে হয়। বিশেষ করে মাছ। নইলে, ফেলে ছড়িয়ে উঠে যায়। আজও মাছ খাইয়ে দিতে হল। কাপড় জামা পরে' তৈরি হয়ে, মিঠুর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল কমল। বেরোবার আগে শ্বাশুড়িকে বলে গেল, 'মা, আসছি।' একথাটা কোনোদিন যদি বলতে ভুলে যায়, তাহলে শ্বাশুড়ি হয়তো বলবেন, 'বড়োমানুষের মেয়ে, আজকাল আমাদের আর গ্রাহ্যই করে না। কমলের বাবা-মা যে গরীব, খোঁটার মধ্যে সে ইঙ্গিতও স্পষ্ট। রাস্তায় নেমে কমল হাঁফ ছাড়ে। অফিসে খাটুনি আছে, পরাধীনতা ও আছে, তবুও দিনের একটা বড়ো অংশ ঘরের বাইরে থাকতে পারার জন্যে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে সে। সারাদিন ঘরে থাকতে হলে হাঁড়ি ঠেলে, আর শাশুড়ির ঠেস্ দেওয়া কথা শুনে সারাটা জীবন কাটাতে হত।

মিঠুকে স্কুলের দরজায় ছেড়ে দিয়ে কমল আবার গিয়ে বাসে উঠল। কি প্রচণ্ড ভিড়! অনেক কষ্টে শাড়ি-ব্যাগ সামলে, একটা রড ধরে দাঁড়িয়ে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল কমল। দেখল, মিঠু তখনও স্কুল বিলডিং-এর বাইরে দাঁড়িয়ে। বাসটা বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর, পিছন ফিরে আস্তে আস্তে স্কুলের দিকে এগিয়ে গেল মিঠু। কমলের দুচোখে জল এসে গেল, ছেলেটা বড্ড সেনসেটিভ।

অফিসে পৌঁছতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। অবশ্য, পাঁচ মিনিটের দেরিকে কেউ আর দেরি বলে মনে করে না আজকাল। অনুকূলকে এক কাপ চায়ের ফরমাস দিয়ে নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল কমল।

পীযূষকে কী একটা কথা জিগ্যেস করতে মুখ তুলল কমল, দেখল, মুরারির চোখ ওরই দিকে। মুরারি প্রেসে প্রুফরীডারের কাজ করে। একটু অস্বস্তি বোধ করল কমল। একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসল মুরারির দিকে চেয়ে। মুরারি মাঝে মাঝে এমনিভাবে চেয়ে থাকে ওর দিকে। কমল লক্ষ করেছে, মুরারি অনেক সময় ওর দিকেই চেয়ে থাকে, কিন্তু দৃষ্টিটা যেন ওর দিকে নেই। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক ভাবে হয়তো অন্য কথা ভাবছে। হয়তো ওর কথাই ভাবছে। তখন বড্ড অস্বস্তি বোধ হয় কমলের। এমনিতে মুরারি খুব ভদ্র ও মার্জিত রুচির মানুষ। একটু লাজুক। কাউকেই কড়া কথা বলতে জানে না। বি. এ. পাশ করেছে। তারপর এই চাকরি। কিন্তু, চাকরির বাইরে ওর একটা আলাদা জগত আছে। বাংলা সাহিত্যের অনেক খুঁটিনাটি ওর জানা। বেশ ভালো লিখতে পারে। ওর দু' একটি প্রবন্ধ ইতিমধ্যে মাঝারি রকমের একটি মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে।

তিন বছর ধরে এক জায়গায় দিনের পর দিন আট ন' ঘণ্টা ধরে এক সঙ্গে কাজ করলে অনিবার্য ভাবে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সে ঘনিষ্ঠতা অফিসের সকলের সঙ্গেই কমলের আছে। মুরারির সঙ্গেও টিফিনের সময় চায়ের কাপ সামনে রেখে মাঝে মাঝে গল্প করেছে। মুরারির সংসারের ইতিহাস মোটামুটি ওর জানা। কিন্তু, যেটুকু জানা, সে তো বাইরে থেকে। মুরারির মনের অন্দর মহলের খবর কি রাখে কমল? বাইরে থেকে যেটুকু সে জানে, তার মধ্যে চমকপ্রদ কিছু নেই। সেই নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের চিরাচরিত অভাব অনটন আর হতাশার কাহিনী। সম্প্রতি একটি বোনের বিয়ে দিতে

পেরেছে মুরারি। বর স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। কলেজে পড়ার সৌভাগ্য হয় নি। পিয়ারলেসে কাজ করে। কোনোমতে চালিয়ে যাচ্ছে। মুরারির বোনটিও আহা-মরি কিছু নয়, স্কুল থেকে পাশ করে টিচার্স ট্রেনিং নিয়ে একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। চেহারাও নিতান্ত সারারণ। এর থেকে ভাল বর ই বা তার জুটবে কোথা থেকে ? বিয়ে দিতে গিয়ে মুরারির বেশ কিছু ধার হয়ে গেছে। বাবা রিটায়ার্ড। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে হাতে সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিলেন। তাই দিয়ে দমদম বাগুইআঁটির দিকে যৎসামান্য একটু আস্তানা বানিয়েছেন বছর ারেক আগে। সেখানেই মুরারিরা থাকে। এখনও আর একটা বোনের বিয়ে বাকি। সে কলেজে যায়। ছোট ভাইটা এখনও স্কুলের গণ্ডি পেরোয় নি। বয়েসেও মুরারির থেকে অনেক ছোট। মুরারির বয়েস তিরিশ হতে চলল। সারাদিন অফিসের কাজ এবং অবসর সময়ে সাহিত্য নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

কমল জানে, মুরারির পক্ষে এখন বিয়ের কথা ভাবাও সম্ভব নয়। কমল এ-ও জানে, বর্তমান বাঙালি সমাজে মুরারির মতো অসংখ্য যুবক নিজেদের বঞ্চিত করে পিতার সংসারের ঘানি টানছে। সে আমলে পরিবার পরিকল্পনা বলে বিশেষ কিছু ছিলও না। সে সময় পরিবার পরিকল্পনার কথা ওঁদের মাথাতেও আসে নি। যখন ওঁরা সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন, ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কাজ থেকে অবসর নিয়ে সংসারের ভার ছেলেদের কাঁধে চাপানো ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনো দ্বিতীয় রাস্তাও ছিল না।

কমল লক্ষ করেছে, মুরারির চোখের দৃষ্টি কমল যেদিকে বসে, সেদিকেই ঘোরাফেরা করে। মুরারি জানে, কমল বিবাহিত। এ-ও জানে, ওর আট বছর বয়েসের একটি ছেলেও আছে। মুরারি সবই জানে, তবুও কমল বোঝে, মুরারির মনের নিভৃত কোণে ওর জন্যে একটুখানি আলাদা জায়গা আছে। সেটা বুঝতে পেরে কমলের যেমন আনন্দ হয়, তেমনি বেদনাও হয়। মুরারির মন ওর দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এ চিন্তার মধ্যে একটা জয়ের আনন্দ আছে বৈ কি! দুঃখ হয় মুরারির জন্যে ; সত্যিই ওর পক্ষে যে মুরারিকে কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়। কমলের একটা নিজস্ব জগৎ আছে, সেখানে কিছুটা জায়গা জুড়ে আছে তার স্বামী, বাকিটা জুড়ে তার ছেলে। সেখানে মুরারির স্থান কোথায় !

মুরারি একটু লাজুক, কমলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আরও লাজুক হয়ে পড়ে। *মাঝে মাঝে মুখ লাল হয়,* মুখে কথা আটকে যায়, অকারণে চুলে হাত বোলায়, জামার বোতাম খুঁটতে থাকে। কমলের সবই চোখে পড়ে। ভাগ্যিস্, কমল যে বোঝে, সেকথা মুরারি বোঝে না। তাহলে তার লজ্জার একশেষ হত। কমল জানে, মেয়েরা অনেক কিছু বোঝে, যা ছেলেদের বুঝতে দেওয়া চলে না। নইলে সংসারে অনেক বেশি অনর্থ হত।

কমল দ্বিতীয়বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, মুরারির চোখ এখনও ওরই দিকে, যদিও ওর চোখের দৃষ্টি শূন্যে কোথাও হারিয়ে গেছে। অন্য কারো চোখে পড়লে ভারী বিশ্রী হবে।

মুরারির মনটা বাস্তবে, ফিরিয়ে আনার জন্যে ও যা-হোক তা-হোক একটা কথা পাড়ল,' আচ্ছা, মুরারিবাবু, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র প্রতিনায়কের নামটা যেন কী ?'

কথাটা বলে ফেলেই জিব কামড়ালো কমল, বুঝল নিজের অবচেতন মনের মধ্যে কোন্ কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতে ওর নিজের মুখই লাল হয়ে উঠল। নিজের উপর একটু বিরক্তও হল কমল।

কমলের প্রশ্ন কানে যেতে মুরারির মুখও লাল হয়ে উঠল, তারপর ছাই-এর মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কথা গুনে গুনে বলার মতো করে বলল সে ঃ

'প্রতিনায়ক কাকে বলে জানিনা। তবে আপনি যার নাম জানতে চাইছেন, সে বোধহয় 'সন্দীপ'।

কমল কোন মতে বলতে পারল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সন্দীপ, সন্দীপ। দিন দশেক আগেই বইটা পড়ছিলাম, নামটা মনে আসছিল, কিন্তু মুখে আসছিল না।'

মুরারি একথার কোনো উত্তর দিল না। ভাবল, কমল হঠাৎ সন্দীপের কথা জিগ্যেস করল কেন ? ও নিজে যথেষ্ট ভদ্র ও সংযমী। ওর চাল চলনে এমন কিছু ঘটেছে কি, যার জন্যে কমল হঠাৎ সন্দীপের কথা তুলল ? কমল কি ইচ্ছে করে সন্দীপের কথা তুলল ? কমল কি ওকে ইঙ্গিতে কিছু বোঝাতে চাইল ? ভীষণ অসোয়াস্তি বোধ হতে লাগল মুরারির। কলমটা খুলে হাতে নিয়ে প্যাঁচার মতো মুখ করে প্রুফের কাগজের দিকে চোখ নামলো মুরারি।

ওদিকে কমলিকার অবস্থাও তথৈবচ। মুখ চুন করে হঠাৎ কলম তুলে খস্ খস্ করে লিখতে সুরু করল সে। এক লাইন লিখবার পর ওর কলমের গতি রুদ্ধ হল। সদ্য লেখা লাইনটা কেটে দিয়ে কলমটা তুলে নিয়ে ফাইলের দিকে চোখ রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কমল।

স্বপন নামে অন্য একটি ছেলেও প্রুফরীডারের কাজে হাত পাকাচ্ছে। ছেলেটির বয়েস বেশি নয়। কিন্তু অকালপক্ক। বয়েস আন্দাজে মন অনেক পরিণত। হালকা কথা বলে আবহাওয়ার গুমোট কাটাতে ওর জুড়ি নেই। অন্য কেউ বিশেষ কিছু খেয়াল করে নি, কিন্তু কিছুই স্বপনের নজর এড়ায় নি। ও বুঝেছিল, এ সময় ওর কিছু একটা বলা দরকার। এমন সময় ওপাশ থেকে গৌতমকে বলতে শোনা গেল,—'কমলদি, হঠাৎ আপনার সন্দীপের কথা মনে হল কেন ?'

কমলিকা এ কথার উত্তর দিল না, ওর মুখটা আরও ফ্যাকাসে দেখালো। স্বপন বলে উঠল, 'ঘরে বাইরের সন্দীপ আর নষ্টনীড়ের অমল, দুটোই প্রকাণ্ড পাষণ্ড।'

সবাই হেসে উঠল, পীযুষ ওধার থেকে বলে উঠল, 'সন্দীপ আর অমলের অপরাধ ? সন্দীপের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু অমল তো দুধের ছেলে ! ওর ওপর তোমার এত রাগ কিসের ?'

স্বপন বলল, 'রাগ হবে না ? বেছে বেছে ঘরের বৌদের সংগে প্রেম করবার দরকার কী বাপু ? দেশে কত অবিবাহিত মেয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের একটার সংগে প্রেমে পড়লেই পারতিস্ ! যত্তো সব !'

ওর কথার ভংগীতে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মুরারি এবং কমলও। অন্য কেউ কিছু বুঝতে পারে নি নিশ্চয়ই ! যদিও গল্পের চরিত্র দুটির সংগে স্বপনের বর্ণনায় মিল সামান্যই আছে, তবু তা নিয়ে তর্ক না তুলে, মনে মনে স্বপনকে ধন্যবাদ জানাল কমল।

এই প্রসঙ্গ থেকে ঘুরে ফিরে আবার মনির কথাই মনে পড়ল কমলিকার। সে-রাতের ঘটনার পর মনির সংগে ওর আর প্রায় কোনো কথাই হয় নি। পরদিন সকলেই সে চলে গিয়েছিল। যাবার আগেও শুধু বলে গিয়েছিল, মিঠু যদি সেতার শেখে, তাতে ওর কোনো আপত্তি নেই। কমলিকা আরও একবার ক্ষমা চাইতে গিয়েছিল, কিন্তু মনি কোনো উত্তর করে নি। কমল ভেবে দেখেছিল, কথাটা সত্যিই বড়ো কঠিন হয়ে গিয়েছিল। এমন শক্ত কথা

আগে কখনো ও মনিকে বলে নি। সমাজ তো সত্যিই পিতৃপ্রধান, মানুষের অবচেতন মনে পিতার প্রভুত্ব তো স্বীকৃত হয়েই আছে। মনিকে, বিশেষ করে, দোষ দিয়ে লাভ কী ?

হঠাৎ গৌতম বলে উঠল, 'কমলদি, আজ হেভি মাঞ্জা লাগিয়েছেন দেখছি, কী ব্যাপার ?' কমলিকার সাজ পোষাকে আজ বিশেষ একটু পারিপাট্য ছিল, তা ও নিজে ভুলে গিয়েছিল! ভুরু তুলে একবার গৌতমের দিকে চেয়ে দেখলে ও, তারপর প্রুফের পাতায় চোখ নামিয়ে বলল, 'বাজে না বকে' নিজের চরকায় তেল দাও !'

পাঁচটা বাজবার কয়েক মিনিট কমলিকা গৌতমকে জিগ্যেস করল, 'বনমালী বোস লেন কোথায়, জানো ?' গৌতম চোখ তুলে একবার কমলিকার দিকে তাকল, তারপর হেসে ফেলে বলল, 'আগে চিনতাম না, এখন চিনি। দু'দিন আগেই তো গিয়েছিলাম !'

কমলিকা জিগ্যেস করল, 'জায়গাটা কোথায় ?'

গৌতম বলল, 'কোথায় যাবেন বুঝেছি। শুভজিৎ রায়ের বাড়ি যাবেন তো ? চলুন আমিও আপনার সংগে যাই।'

কমল বলল, 'তোমাকে সংগে যেতে হবে না। জায়গাটা শুধু চিনিয়ে দাও।'

গৌতম কমলিকাকে বনমালী বোসের ডিরেকশন বুঝিয়ে দিয়ে, বলে' উঠল,' একঘেয়ে প্রুফ দেখার কাজ আর ভাল লাগে না।'

কমল বলল, 'আমাকে নালিশ জানিয়ে লাভ নেই। তোমার মেয়ে বন্ধুকে জানিয়ো। যাই হোক পাঁচটা বাজে, আমি আজ উঠি। কাল আবার দেখা হবে।'

কয়েকটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে এবং একে-ওকে-তাকে জিগ্যেস করতে করতে, শেষ পর্যন্ত শুভজিতের বাড়ির দরজার সামনে এসে পেঁছিল কমলিকা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক মিনিট অপেক্ষা করল, তারপর কড়া নাড়ল। ভিতর থেকে কোনো সাড়া নেই। তখন আস্তে আস্তে ঠেলে দেখল। দরজা খোলা। উঁকি ঝুঁকি মেরে কাউকেই দেখতে পেল না কমল। পরের বাড়ি। চট্ করে ঢুকতে সংকোচও হয়। তাই আবার কড়া নাড়তে আরম্ভ করল। যখন বিরক্ত হয়ে ফিরে যাবে কিনা ভাবছে, তখন ভিতর থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল। সামনে এসে দাঁড়াল শুভজিৎ।

খালি গা, সারা গা দিয়ে জল ঝরছে, কোমরে জড়ানো একটা তোয়ালে। শুভজিৎ বলল, 'আপনাকে সেদিন জলসায় দেখেছি না? আসুন, ভেতরে আসুন, কী দরকার, বলুন।

শুভজিতের মূর্তি দেখে কমলিকা একটু লজ্জা পেল, কিন্তু শুভজিতের সেদিকে খেয়াল ছিল না। কমলিকা বলল, 'আমার ইচ্ছে, আপনি আমার ছেলেকে সেতার শেখান।' তারপর লজ্জায় একটু লাল হয়ে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনি ভেতর থেকে কাপড় টাপড় ছেড়ে আসুন, তারপর কথা হবে।

এতক্ষণে শুভজিৎ নিজের দিকে চেয়ে দেখল। সামনে একটি সুসজ্জিতা মহিলা, আর ওর পরিধানে যৎসামান্য একটুকরো তোয়ালে। ও তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে, ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আপনি ঘরের ভেতরে এসে বসুন, আমি এখুনি আসছি।'

কমলিকা ঘরের ভিতরে এল। দেখল, সতরঞ্চির উপর একটা সেতার শোয়ানো রয়েছে, জানলা দিয়ে চাঁদের আলো পড়ে সেতারটা ঝক ঝক করছে। পাশে একজোড়া তবলা। দেরাজের উপর নানা ধরনের বই এবং ছবি। বই-গুলো উল্টে পাল্টে দেখল কমলিকা। দেয়ালে টাঙানো ফোটোর দিকে নজর পড়ল, সামনে গিয়ে দেখল, ফোটোটার নিচে বাংলায় নাম লেখা রয়েছে, পণ্ডিত 'মহাদেবপ্রসাদ মিশ্র।' কে যেন নামটা হাতে লিখে দিয়েছে। মহাদেব প্রসাদ মিশ্রের নাম কে না জানে? শুভজিৎ তাহলে মহাদেবপ্রসাদের শিষ্য, তাই এত ভাল বাজায়!

কমলিকা ভাবল এত বড়, বাড়িতে শুভজিৎ একলা থাকে নাকি! অন্য কারো তো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শুভজিতের বিয়ে হয়েছে কি? তার পর মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল কমল, তোমার এত কথা জানবার কি দরকার বাপু? শুভজিতের বিয়ে হোক বা না হোক, তাতে তোমার কি?

সেতারের দিকে ওর চোখ পড়ল আবার। আস্তে আস্তে গিয়ে সতরঞ্চির উপর বসল। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে তার গুলো। সেতারটা একবার ডান হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল ও। তারপর, তারের উপর হাত ছোঁয়াল এক-বার। রিন রিন করে আওয়াজ করে উঠল সেতারটা। এবং তখনই দরজার দিক থেকে খুট্ করে আওয়াজ আসতে চমকে উঠল কমলিকা। ফিরে তাকিয়ে দেখল, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে শুভজিৎ ওর দিকে চেয়ে বলছে, আপনি

সেতার বাজাতে জানেন বুঝি ? ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পেল কমলিকা। সেতারটা অত জোরে আওয়াজ করে উঠবে, ও বুঝতে পারে নি। শুভজিতের দিকে চেয়ে দেখল, ওর পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি। কমলিকা ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনার বাড়ির লোকেরা সব কোথায় ?'

মা আর বৌদি আজ কালিঘাটে গেছেন। কিসের যেন পর্ব আছে আজ। দাদা অফিস থেকে এখনও ফেরেন নি। দোতলায় একঘর ভাড়াটে আছে অবশ্য, এখন তারাও বাড়িতে নেই। বাড়িতে আমি এখন একলা।' বলে' শুভজিৎ হাসলো।

এদিক ওদিক চেয়ে শুভজিৎ হঠাৎ বলে উঠল, 'একটু চা খাবেন নাকি ?' কমলিকা হেসে উত্তর করল, 'না, চা থাক। আপনার তো আবার দোকানে যেতে হবে কিনে আনতে ?'

শুভজিৎ হেসে বলল, 'দোকানে যেতে হবে কেন ? ষ্টোভে চা বানানো এমন কিছু শক্ত নয়, আমি পারি।'

কমলিকা শুধু বলল, 'না, থাক।'

শুভজিৎ বলল, 'তবে আপনার ছেলের কথা বলুন। তার বয়েস কত ?' কমলিকা উত্তর করল, 'ও এখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে।'

উত্তর শুনে হেসে ফেলল শুভজিৎ। বলল, 'তবে আর দু'এক বছর বাদে ছেলেকে আনবেন। তখন শেখাবো।'

কমলিকা শুভজিতের কথায় সন্তুষ্ট হল না ; বলল, 'আপনি কোন্ বয়সে সেতার শিখতে আরম্ভ করেছিলেন ?'

শুভজিৎ একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'কী জানেন, আমরা সকলেই একটা-না-একটা গুণ নিয়ে জন্মাই, কেউ ছেলেবেলা থেকেই ভালো অঙ্ক কষতে পারে, অন্য কেউ আবার আশি বছরেও পারে না। কারো ইতিহাসে জন্মগত অধিকার, কারো সাহিত্যে, কারো বা সঙ্গীতে। মিউজিকে আমার ঝোঁক জন্ম থেকেই।'

কমলিকা বলল, 'আমার ছেলেরই বা জন্ম থেকেই মিউজিকে ঝোঁক থাকতে বাধা কিসের ?'

শুভজিৎ হেসে ফেলে বলল, 'না, বাধা নেই। তাহলে, কবে থেকে আরম্ভ করতে চান, বলুন।'

কমলিকা চিন্তা করে সামনের রবিবার দিন স্থির করল। শুভজিৎ বলল,

সেদিন সকাল সকাল চলে আসবেন। প্রথম দিন ছেলেকে নতুন কাপড় পরিয়ে আনবেন। প্যান্ট নয়, ধুতি। আমাদের ঠাকুরমশাই হোম করবেন।'

শুভজিতের কথা শেষ হতে না হতে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল। কমলিকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আজ আসি তাহলে। রবিবার সকাল আটটা-সাড়ে-আটটার মধ্যে মিঠুকে নিয়ে চলে আসবো।'

পাঁচ

শুভজিৎদের বাড়ির সামনের গলিতে সকাল আটটা থেকে বেশ কয়েকজন মানুষের ভিড়। বেশির ভাগই শুভজিতের ছাত্র-ছাত্রী। গলিটাতে জল ঢেলে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। গলির মাঝামাঝি একটা জায়গায় চার দিকে চারটে ইঁট পেতে হোমকুণ্ড তৈরি করা হয়েছে। হোমকুণ্ডে আগুন জ্বলছে, পুরোহিত মৃদুস্বরে মন্ত্রপাঠ করছেন। কুণ্ডের একপাশে দুটি আসনে বসে শুভজিৎ এবং মিঠু। ওদের সামনে একটা সেতার, একজোড়া তবলা এবং একটি হারমোনিয়াম। শুভজিৎ এবং মিঠু। গুরু এবং শিষ্য। আজ মিঠুর গুরুবরণ উৎসব। গলির বাইরের দিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু, চন্দ্রানী, বিজন এবং পারমিতা। তাছাড়া, রানা নামে শুভজিতের তরুণ ছাত্রটি আছে, এবং পাড়ার কয়েকটি মানুষও। গলির ভিতরে সদর দরজার সামনে বাড়ির মানুষেরা,—শুভজিতের মা, বৌদি, এবং ভুতু। এবং ওদের পাশে দাঁড়িয়ে কমলিকা। রণজিৎ সাধারণত এসব উৎসবে অংশগ্রহণ করে না। সে নিজের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। যজ্ঞকুণ্ডে আগুন যতখানি, ধোঁয়া তার থেকে বেশি। ধোঁয়ার দাপটে কারো চোখই শুকনো নেই।

হঠাৎ পুরোহিতের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে অন্দর থেকে উচ্চ কলরব শোনা গেল। মা ছুটে ভিতরে চলে গেলেন। বৌদি শুকনো মুখে ভিতর বার করতে লাগলেন। ভুতু মাঝে মাঝে সকলের কথায় ফোড়ন কাটছিল, এবং মধ্যে মধ্যে মিঠুকে বিশেষ ভাবে লক্ষ করছিল। আজকের উৎসবে মিঠুর

অংশই যে সবচেয়ে প্রধান, সে কথা ভুতুর অজানা নয়। হয়তো সেই ...

ভুতুর একটা চোখ মিঠুর দিকে পড়েছিল।

শুভজিৎ এবং মিঠুর পরনে গরদের ধুতি, দুজনের কারো গায়েই জামা নেই। বেশির ভাগ মন্ত্রই পুরোহিত নিজে পাঠ করছিলেন, মাঝে মাঝে ওদের দুজনকে কোন কোন মন্ত্র পড়বার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে ভিতরের গোলমাল আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। মা বাইরে এসে শুভজিৎকে বললেন, 'সুবু, তুই একবার ভেতরে আয় বাবা, নইলে ওরা আজ আর থামবে না।'

শুভজিৎ একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি গিয়ে কি কিছু সুবিধে করতে পারব ?'

কমলিকা বলল, 'না, না, আপনি একবার ভেতরে যান।' শুভজিৎ পুরোহিতের দিকে চাইতে তিনিও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। শুভজিৎ মিঠুকে আসনে বসে থাকতে বলে উঠে দাঁড়াল।

বাড়ির ভিতরে যে গণ্ডগোল, তা স্বাভাবিক, এবং নিত্যনৈমিত্তিক। যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে গোলমাল, তা মেটানোর সাধ্য কারো নেই। বাড়িতে মানুষ অনেকগুলি, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় জলের আমদানি কম। ভাড়াটে পাঁচু লাহিড়ী রাগী মানুষ। পাঁচু-গৃহিণী দীপালি বৌদি মন্দ মানুষ নয়, কিন্তু স্বার্থে ঘা লাগলে ফোঁস্ করে ওঠে। বাড়ির কর্তা রণজিৎ এমনিতে মুখচোরা ভালমানুষ গোছের লোক। কিন্তু রাগলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। শুভজিৎ ভিতরে যেতে যেতে পাঁচুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'জলের ব্যবস্থা নেই, তো ভাড়াটে বসিয়েছিলেন কেন ?'

রণজিতের উত্তর শোনা গেল, 'না পোষায়, উঠে যান, আমি কি আপনাকে থাকবার জন্যে পায়ে ধরে সাধতে গেছি ?'

পাঁচু বলে উঠল, 'আমরা আসবার আগে কিন্তু পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলেন।'

রণজিৎ বলল, 'মুখ সামলে কথা বলবেন, বলে দিচ্ছি।'

পাঁচুর গলা শোনা গেল, 'আমি পুলিশে খবর দেব।'

রণজিৎকে বলতে শোনা গেল, 'তাই যান না, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? পুলিশ এসে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাক।'

অন্দরের দিকে যেতে যেতে শুভজিৎ ভাবল, বাড়ির ভিতর একটা

টিউবওয়েল বসাতে না পারলে আর চলছে না। কিন্তু তাতে হাজার কুড়ি-পঁচিশ খরচ। কোথা থেকে এত টাকা ও যোগাড় করবে? শুধু তাই নয়। রাজ্যের লোক এসে দিনরাত টিউবওয়েল ব্যবহার করবে, এবং দু চার মাসের মধ্যেই সেটা অব্যবহার্য হয়ে যাবে।

উঠোনের কাছে পৌঁছে দেখল, দুই প্রতিপক্ষ যোদ্ধা চোখ রক্তবর্ণ করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে। আসন্ন যুদ্ধে পাঁচুর বলাবল কিছু বেশি, কারণ তাঁর গৃহিণী কোমরে হাত দিয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে। শুভজিতের বৌদি ৫ সব ঝগড়া বিবাদে কখনো থাকে না, আজও নেই।

রণজিৎ শুভজিতের থেকে বয়সে অনেক বড়ো, তাই ও সর্বদাই দাদার সম্মান রক্ষা করে চলত; সে দাদাকে কিছু না বলে পাঁচু লাহিড়ীর দিকে এগিয়ে গেল, 'পাঁচুদা, ঘরে যান, আমি জলের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

পাঁচু গোঁ ধরে বলল, 'তুমি কিছু বোঝোনা, এ সমস্যার একটা সমাধান আজই হওয়া দরকার।'

শুভজিৎ একটু হেসে বলল, 'পাঁচুদা, আপনারা মাথা ফাটাফাটি করে ফেললেও সমস্যা মেটাতে পারবেন না। আমরা যতটা জল পাই, তার থেকে বেশি জল মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। ঐ জলেই কণ্ট করে চালাতে হবে। যাই হোক, আজ আপনাকে কয়েক বালতি জল বাইরে থেকে আনিয়ে দিচ্ছি। কাল থেকে সাবধানে সময় হিসেব করে জল খরচ করবেন।'

শুভজিৎ ফিরে দেখল, রণজিৎ ইতিমধ্যে নিজের ঘরে ফিরে গেছে। পাঁচু লাহিড়ীও গৃহিণীকে নিয়ে গৃহাভিমুখী হ'ল। শুভজিৎ জানে, পাঁচুরই দোষ। পাঁচ বছর আগে বাবা মারা যাবার সময় পাঁচু লাহিড়ী এ বাড়িতে আসে। জলের অবস্থা জেনেই সে এ বাড়িতে এসে উঠেছিল। আজ রবিবার, দেরি করে ঘুম থেকে উঠে, কাগজ-টাগজ পড়ে যখন স্নানের জন্যে সে প্রস্তুত হল, ততক্ষণে জলের টাইম পার হয়ে গেছে। অতএব, যত দোষ নন্দ ঘোষ। সব দোষই বাড়িওয়ালার। যতই লম্বা চওড়া কথা বলুকনা কেন, এ বাড়ি ছেড়ে পাঁচুর অন্য কোথাও যাবার সাধ্য নেই। কারণ, যেখানেই যাবে, সেখানেই চতুর্গুণ ভাড়া গুণতে হবে।

যজ্ঞকুণ্ডের দিকে ফিরতে ফিরতে বাবলুর কণ্ঠস্বর কানে গেল ওর, 'এই ভুতু, তুই মিঠুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছিস্ কেন রে?' ভুতুও পিছিয়ে

যাবার পাত্রী নয়, সে বলল, 'বেশ করছি, তাকিয়ে আছি। তোমার বুঝি হিংসে হচ্ছে ?'

ভুতুর কথায় সবাই হেসে উঠল, শুভজিতের কানে গেল। শুভজিৎও মনে মনে হেসে ফেলল। ভুতুর সব সময় অমনি পাকা পাক কথা !

গলিতে পোঁছে দেখল, ইতিমধ্যে তিমির এসেছে, এবং চন্দ্রানীর সঙ্গে এক কোণে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কথা বলছে। তিমিরকে দেখে ও একটু আশ্চর্য হল, কারণ আজকের উৎসবে তিমিরের নিমন্ত্রণ নেই। যাই হোক, সে তিমিরের দিকে হাত নেড়ে বলল, 'কি খবর ?'

তিমির ও হাত নাড়ল, বলল, 'এই, চলে যাচ্ছে। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই। তা, দেখছি, আপনারা ব্যস্ত। আমি আজ চলি, আর একদিন আসবো।'

শুভজিৎ বলল, 'এসেছেন যখন, আর একটু থেকে যান আমাদের আর বেশি দেরি নেই। তারপর একটু মিষ্টিমুখ করবেন।'

হোম, যজ্ঞ, পুজো, পুরোহিত, এসব বস্তুর সঙ্গে তিমিরের কোনো সুবাদ নেই। সে বলল, 'না, না, আজ আমার তাড়া আছে। আর একদিন মিষ্টি খেয়ে যাবো। আমি চলি।' বলে চন্দ্রানীকে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় বলল, 'যা বললাম, শুভবাবুকে জানিয়ো। আমি আবার আসবো।'

শুভজিৎ ঘাড় উঁচু করে দেখল, চন্দ্রানীর দিকে হাত নাড়তে নাড়তে তিমির চলে যাচ্ছে। শুভজিৎ ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল, চন্দ্রানীর সঙ্গে তিমিরের এত কথা কিসের ? চন্দ্রানীকে 'পপ' সংগীতের দলে টানবার তালে আছে না কি ? যাই হোক, ও-ও হাত নেড়ে তিমিরকে বিদায় জানাল।

শুভজিৎ একটু অন্যমনস্ক হল। একবার তিমিরের কথা ভাবল, একবার চন্দ্রানীর কথা। তারপর মুখ তুলে দেখল, পুরোহিত মিঠুর ডান হাতের কব্জিতে লাল রঙের একটা রাখি বেঁধে দিলেন। তারপর বললেন, 'আজ থেকে শুভজিৎ তোমার গুরু। গুরুবরণের গুরুত্ব সম্পর্কে মিঠুর কোনো ধারণা নেই, কিন্তু, জলজ্যান্ত একটা গুরু পেয়ে সে খুব খুশি। সে মাথা নেড়ে হাসি মুখে বলল, 'আচ্ছা।' ব্রাহ্মণ তখন মিঠুকে বললেন, 'গুরুকে প্রণাম করতে হয়, তুমিও তোমার গুরুকে প্রণাম করো।'

মিঠুর প্রণাম শেষ হ'লে সকলে মিলে ঘরের ভিতরে গেল। শুভজিৎ

মিঠুকে একটা গান গাইতে বলল। মিঠুর গান শুনে শুভজিৎ খুব খুশি। গলায় কাজও আছে, সুরও আছে, বয়স আন্দাজে ওর গলা যথেষ্ট পরিণত। শুভজিৎ কমলিকার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলল, 'সংগীতে আপনার ছেলেরও জন্মগত অধিকার, ও ঠিক পারবে।' কমলিকা হেসে বলল, 'সে ওর গুরুর আশীর্বাদে।' উত্তরে শুভজিৎ হেসে ফেলল, তারপর মিঠুকে বলল, 'এসো, আজই তোমাকে সেতারের কিছু প্রিলিমিনারি লেস্‌ন্‌ দিয়ে দিই।' কমলিকা বাধা দিয়ে বলল, 'লেস্‌ন্‌ দিতে হয়, পরে দেবেন, আগে আপনারা সকলে একটু মিষ্টি মুখ করুন।'

কমলিকা যখন মিষ্টান্ন বিতরণ করছিল, তখন জানলায় একটি ছেলের হাসি হাসি মুখ দেখা গেল। শুভজিৎ ভিতর থেকে ডেকে বলল, 'এই বুদ্ধ, ভেতরে আয়।' বুদ্ধ ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করল না, হাসি হাসি মুখে শুভজিতের দিকে চেয়ে রইল।

কমলিকাও ভিতর থেকে ডেকে বলল, 'খোকা, ভেতরে এসো, সবাই মিষ্টি খাচ্ছে, এসো, তোমাকেও দুটো মিষ্টি দিই। ছেলেটি কমলিকার কথার উত্তর দিল না, ওর দিকে ফিরেও চাইল না, শুধু একই ভাবে শুভজিতের মুখের পানে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে রইল।

ছেলেটি হঠাৎ মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর শুভজিতের দিকে ফিরে বলল, 'ঐ দ্যাখো, ঐ দ্যাখো, এতক্ষণে আকাশে মেঘটা এসে গেছে, আজ বিকেলে বিষ্টি হবে।'

শুভজিৎ জিগ্যেস করল, 'আজকের তাপমাত্রা কত রে?'

বুদ্ধ উত্তর করল, 'আটাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস।'

'কাল কত হবে?'

'ঊনত্রিশ।'

'পরশু?'

'সাতাশ-আটাশ।'

'তার পরের দিন?' শুভজিৎ জিগ্যেস করল। ছেলেটি আকাশের দিকে চেয়ে ছিল, চেয়েই রইল, শুভজিতের কথার কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

'এই বুদ্ধ, পরশুর পরের দিন তাপমাত্রা কত হবে রে?' শুভজিৎ আবার জিগ্যেস করল।

'জানি না', বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'জানিস্ না কেন? কাগজে কিছু লেখেনি?'

'নাঃ, বলে জানলায় শিক ছেড়ে দিয়ে পিছন ফিরে ছেলেটি আবার আকাশের দিকে মুখ তুলল।

কমলিকা জিগ্যেস করল, 'ছেলেটি কে?'

শুভজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পরে বলছি, আপনি আমার হাতে একটা সন্দেশ দিন তো?' সন্দেশ নিয়ে শুভজিৎ বাইরে গেল, বুদ্ধ তখনো আকাশের পানে তাকিয়ে।

শুভজিৎ বাইরে এসে বুদ্ধকে বলল, 'হ্যাঁ রে, তুই আকাশের দিকে চেয়ে কী দেখছিস্ রে?

বুদ্ধ বলে উঠল, 'দেখছ না, মেঘের টুকরোগুলো একটু একটু করে দক্ষিণে সরে যাচ্ছে? ভাবছি, বিষ্টিটা তাহলে কোথায় হবে? টালিগঞ্জে, না বেহালায়?'

শুভজিৎ বুদ্ধের কথার উত্তর না দিয়ে ওর হাতে সন্দেশ দিয়ে বলল, 'এই নে।'

বুদ্ধ কিছুক্ষণ সন্দেশের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল, তারপর বলে' উঠল, 'এটা দিয়ে কী হবে?'

শুভজিৎ বলল, 'তোর জন্যে এনেছি; খেয়ে নে।'

বুদ্ধ আরো কিছুক্ষণ সন্দেশটার দিকে চেয়ে রইল, তারপর সন্দেশটা হঠাৎ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর শুভজিতের দিকে ফিরে হাসতে লাগল।

শুভজিৎ কিছু বলল না, দেখল, জানলা দিয়ে কমলিকা ওদের দিকে চেয়ে রয়েছে। কমলিকার চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন। শুভজিৎ কমলিকার দিকে চেয়ে ফ্যাকাসে হাসি হাসল। বুদ্ধের দিকে ফিরে দেখল, সে আকাশের দিকে চাইতে চাইতে চলে যাচ্ছে। অপসৃয়মান বুদ্ধের দিকে এক মিনিট চেয়ে রইল শুভজিৎ, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীর পায়ে ঘরে ফিরে এল।

কমলিকা জিগ্যেস করল, 'কি সুন্দর ছেলেটা, কিন্তু কেমন যেন, তাই না?'

শুভজিৎ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করল, 'হ্যাঁ।'

কমলিকা আবার জিগ্যেস করল, 'ছেলেটি কে ?'

শুভজিৎ অন্যমনস্ক ছিল, বলল, 'কার কথা বলছেন ? ও, বুদ্ধের কথা ! ও আমাদের পাশের বাড়ির মানিকদার ছেলে। মানিকদা প্রিয়নাথ ইন্স্টিটিউশনের অংকের শিক্ষক।। প্রীতি বৌদিও কাছাকাছি একটা মেয়েদের স্কুলে অংক পড়ান। ওঁদের ঐ একটাই ছেলে। ছেলেটা দেখতে ভাল, অংকে দারুণ মাথা, কিন্তু কেমন যেন। জন্মের সময় কোনো একটা দোষ হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। মানিকদা অনেক ডাক্তার বদ্যি করিয়েছেন, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। একদম র্যাশনাল মানুষ ছিলেন, এখন পুরোপুরি ভাগ্যবাদী হয়ে গেছেন। আজকাল বলেন, ওঁদের দুজনের কোষ্ঠীতেই দোষ ছিল, ওঁদের স্বাভাবিক ছেলে হবার কথা নয়। মানিকদা আর প্রীতি বৌদির কথা ভাবলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

কমলিকা জিগ্যেস করল, 'ছেলেটির গণ্ডগোল কোথায় ? ।'

শুভজিৎ উত্তরে বলল, 'কোথায় আর ? হেড অফিসে।' বলে নিজের মাথাতেই গোটা কয়েক টোকা মেরে হাসল শুভজিৎ। বলল, 'হাসছি বটে, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই আনন্দের নয়। সমস্যা হল, বুদ্ধ আমাদের আর সকলের মতো নয়। ওর একটা আলাদা জগৎ আছে। সেই জগতের নাড়ী নক্ষত্র ওর নখদর্পনে। কাল বিষ্টি হবে, না পরশু ঝড় উঠবে, সেকথা জানতে হলে বুদ্ধকে জিগ্যেস করুন, একেবারে পাকা খবর পাবেন। একদিন মানিকদা ওকে এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ করতে বলেছিলেন, ও মুখে মুখে হিসেব করে দশমিনিটের মধ্যে ঠিক উত্তর দিয়ে দিয়েছিল। এত মাথা, তবু কোথায় যে গণ্ডগোল, তা কেউ জানে না। ডাক্তাররাও বিশেষ কিছু জানেন বলে মনে হয় না।

শুভজিৎ চুপ করবার পর কমলিকার মুখ থেকে ভারী একটা নিঃশ্বাস পড়ল। আনন্দময় সকালের আলোর উপর কোথা থেকে একটুকরো বেদনার ছায়া এসে পড়ল। প্রীতি বৌদি এবং মানিকদাকে কখনো দেখেনি কমলিকা, কিন্তু তাঁদের প্রতি সমবেদনায় ভরে উঠল ওর মন।

সকালের হাঙ্গামা মিটতে মিটতে বারোটা বেজে গেল। শুভজিৎ বিশ্রাম করবার সময় পেল না মোটেই। বাবলু আর কমলিকাকে নিয়ে বিকেলের দিকে ও একবার বেরোলো ; মিঠুকে সস্তায় ভাল সেতার কিনে দিতে হবে। শুভজিৎ সেতার চেনে, কিন্তু দোকানদারের সংগে দরদস্তুর করতে পারে না

কোনোদিনই। সেই জন্যে বাবলুকে সংগে নিল। বাবলু চৌকস ছেলে। সে শুভজিৎ এবং কমলিকাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে আসতে পারে। কয়েকটা দোকানে ঘুরে ছোট সাইজের ভাল একটা সেতার পাওয়া গেল বারোশো টাকায়। টাকাটা অনেক, কিন্তু কমলিকার তাতে দুঃখ নেই। ওর একটি মাত্র ছেলে, ওর জন্যেই তো সব। মনিও শেষ পর্যন্ত সেতার শেখানোর ব্যাপারে মত দিয়ে গেছে। সেতার কেনবার পর ওরা একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে কফি হাউসে এসেছে আধ ঘণ্টার জন্য। কমলিকার আজ আনন্দের দিন। মিঠু আজ সংগীতের গুরু পেয়েছে, ভালো একটা সেতার কেনা হল, কিন্তু কেন যেন সকাল থেকে সারাটা দিনই থেকে থেকে বুদ্ধের কথা মনে পড়ছে। শুভজিৎ বলছিল, 'ছেলেটা কোনোদিনও স্কুলে যায় নি, কিন্তু যে সব অংক স্কুলে শেখানো হয়, তার প্রায় সবটাই ওর জানা। যে বস্তুকে ধরা-ছোঁয়া যায়, তা বুঝতে বুদ্ধের দেরি হয় না, কিন্তু, যা অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়, তা ওর বুদ্ধির অতীত ; যেমন হিংসা, দ্বেষ, প্রেম, ভালবাসা, এসবের কোনো অর্থ বুদ্ধের কাছে নেই। বুদ্ধের মতো এমন সরল নিষ্পাপ মন আর দেখবেন না। বয়স পনেরো ষোলো, কিন্তু ওর মনটা একেবারে পাঁচ বছরের শিশুর মতো নির্মল। আমার সংগে ওর এমনিতে খুব বন্ধুত্ব, কিন্তু কখনো কখনো মনে হয় যেন ও আমাকে চিনতে পারছেনা। তখন আমার কি মনে হয় জানেন? ও অন্য একটা জগতের মানুষ, কিভাবে যেন আমাদের এই পৃথিবীতে ছিট্‌কে এসে পড়েছে।'

কমলিকা জিগ্যেস করল, 'আপনি এত ছেলে মেয়েকে বাজনা শেখান, ওকে শেখানোর চেষ্টা করেন না কেন?

শুভজিতের মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ল। একটু কাল চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'আগে অনেক চেষ্টা করেছি, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। হঠাৎ এক একদিন ওর শিখবার ইচ্ছে হয়। সেদিন ও পঞ্চাশদিনের শেখা একদিনে শিখে ফ্যালে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই ও আকাশের চাঁদ, তারা এবং পৃথিবীর আবহাওয়ার খবর নিয়েই দিন কাটায়। আমি আজকাল আর ওর ওপর জোর করি না। কিন্তু ওর কথা আর নয়। ওর কথা ভাবলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

কমলিকাই কফিহাউসের বিল মেটালো। তারপর মিঠুর হাত ধরে এগিয়ে

যেতে যেতে বলল, আজ আমি আসি, আমাকে আবার বাসে করে অনেকটা পথ যেতে হবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল শুভজিতের। এসে দেখল, বৌদির সংগে বাইরের ঘরে বসে গল্প করছে চন্দ্রানী। বলল, 'তুই এখানে কী করছিস্ ?' চন্দ্রানী ভুরু কুঁচকে বলল, 'কিছু নয়, কিন্তু, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? আজ বিকেলে রানার আসবার কথা ছিল, মনে নেই ?'

শুভজিৎ বিচলিত হয়ে বলে উঠল, 'তাইতো ! আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।' বৌদি মৃদু হেসে বললেন, 'তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি। রানার মা গিয়ে চন্দ্রানীকে ডেকে নিয়ে এলেন। ওই তো এতক্ষণ পর্যন্ত রানাকে দেখাচ্ছিল।

শুভজিৎ চন্দ্রানীর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল, বলল, 'তুই আমাকে আজ বাঁচিয়েছিস্।'

চন্দ্রানী উত্তরে বলল, বেশ করেছি ; কিন্তু, তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?'

শুভজিৎ বলল, 'মিঠুকে একটা সেতার কিনিয়ে দিলাম। মিঠুর মা আর বাবলুকে নিয়ে এতক্ষণ দোকানে দোকানে ঘুরছিলাম।'

শুভজিৎ দেশলাই দিয়ে ধূপের কাঠি জেবলে গুরুদেবের প্রতিকৃতির সামনে রাখতে রাখতে কথা বলছিল। তারপর পিছন ফিরে চন্দ্রানীর মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। চন্দ্রানীর মুখ পাথরের মতো কঠিন। শুভজিৎ কিছু একটা বলতে গেল, তার আগে চন্দ্রানী উঠে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল, 'তাই বলো ! তাই সারাটা দিন বাবলুটারও টিকি দেখতে পাই নি।' বৌদির দিকে ফিরে বলল, 'আসি বৌদি।' বলে শুভজিতের পানে আর দৃক্‌পাত মাত্র না করে চোখের কোণে বিদ্যুৎ ছড়াতে ছড়াতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। শুভজিৎ গুরুদেবকে প্রণাম জানাতে ভুলে গেল। বিস্মিত শুভজিৎকে একলা রেখে বৌদিও অন্দরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ছয়

শুভজিৎদের বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট খাটো বস্তি আছে। সেখানে সবসুদ্ধ পঁচিশটি পরিবার বাস করে। অনেক কাল আগে এই ছোট ছোট বাড়িগুলি স্থানীয় জমিদারের কর্মচারিদের বাসস্থান ছিল। গত একশো বছরে এই বাড়িগুলি একটা স্থায়ী বস্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। জমিদার বাড়িটা একশো বছর ধরে একটু একটু করে ধ্বংস হয়ে গেছে। বাড়িটা এখন মাড়োয়ারীদের দখলে। কিছু দিনের মধ্যে সেখানে একশো ফ্ল্যাটের ম্যানশন উঠবে। বস্তিটার ভিতরে দেড় ঘর-ওয়ালা একটা কুঠুরির মালিক ছিল চন্দ্রানীর বাবা নগেন গুহ। নগেনের স্কুল কলেজের বিদ্যে বিশেষ ছিল না। বাইরের ঘরটাতে সে কামারশালা বসিয়েছিল, ভিতরের আধখানা ঘরে নগেন তাঁর বৌ আর মেয়েকে নিয়ে শুত। সারাদিন গন্‌গনে আগুনের সামনে বসে হাতুড়ি দিয়ে গরম লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে নানা রকমের যন্ত্রপাতি বানাত সে। তারপর সন্ধ্যে থেকে তাড়ি খেয়ে যতক্ষণ জ্ঞান থাকত, ততক্ষণ হল্লা করত। সারাদিন আগুনের সামনে বসে থেকে থেকে ওর মুখের চামড়া ঝলসে গিয়েছিল।

চন্দ্রানীর মা আরতি বিয়ের কিছুদিন বাদেই বুঝে গিয়েছিল, স্বামীর রোজগারের উপর নির্ভর করলে অনাহারে মরতে হবে। নিজেও লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি, কিন্তু কিছু-না-কিছু উপার্জন করতেই হবে। কারণ, নগেন সারাদিনে যা রোজগার করে, সন্ধ্যে বেলায় তাড়ির পিছনে সেটা উড়িয়ে দেয়। ততদিনে আরতির পেটে বাচ্চাও এসে গেছে। আরতি বুঝল, যে ভাবেই হোক, তিনটে পেট চালানোর ব্যবস্হা তাকে করতেই হবে। কিছু দিন এ বাড়ি ও বাড়ি ঝি-গিরি করে কিছু রোজগার করেছিল; পরে ভেবে দেখল, ঝিয়ের কাজে রোজগার বিশেষ হয় না, কিন্তু আত্মসম্মান যথেষ্ট পরিমানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো বাড়িতে আবার নির্লজ্জ বেহায়া পুরুষ মানুষের সান্নিধ্যেও আসতে হয়। বাড়ি থেকে আধমাইলের মধ্যে ছোট খাটো একটা হাসপাতাল আছে, আরতি সেখানে গিয়ে দাই-এর কাজ নিল। রোজগারে বিশেষ পরিবর্তন হল না, কিন্তু দাই-এর কাজ

অন্তত ঝি-এর কাজের থেকে সম্মানজনক। তাছাড়া, হাসপাতালে যারা রোগ সারাতে আসে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কখনও কখনও টাকা বা অন্য কিছু উপহারও দেয়।

বস্তিটার উল্টো দিকে, রাস্তার ও পাশে, ছোট বড় অনেকগুলি বাড়ি। তারই একটাতে থাকে বাবলুরা। বাবলুর প্রপিতামহ জনার্দন চক্রবর্তী এককালে জমিদার বাড়ির পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিত বৃত্তির সংগে সংগে বাস করবার জন্যে তিনি একটা বসত বাড়ি পেয়েছিলেন। সে বাড়ি এখন বাবলুদের নিজস্ব হয়ে গেছে। কাছাকাছি একটা স্কুল ছিল, বাবলু সেখানে পড়ত, এবং বিকেল বেলায় পাড়ার ছেলেদের সংগে ডাংগুলি খেলে বেড়াত।

চন্দ্রানীর যখন মাত্র দশ বছর বয়স, তখন তার বাবার মৃত্যু হল। ছেলেবেলা থেকে সমানে তাড়ি গিলেছে, পেটে ভাল খাবার কোনোদিনই পড়ে নি, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই লিভার পেকে যায়-যায় অবস্থা। মরবার আগে মাস দুয়েক শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। একদিন আরতিকে ডেকে বলল, 'কোনোদিন শরীরের যত্ন করতে শিখিনি। যখন বুঝলাম, তখন অনেক দেরী হয়ে গেল।' নগেন যেদিন মারা যায়, সেদিন ওদের ঘরে ডাক্তার এসেছিলেন, ইনজেকশন দিয়ে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু, কোনো কাজ হল না। চন্দ্রানীর বয়স তখন দশ, আরতির তিরিশ। স্বামীর সংগে আরতির যোগা-যোগ প্রায় ছিলই না, বসতবাড়িটা আর মেয়েটা ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে সে কিছু পায়ও নি। নগেনের মৃত্যুতে ও আঘাত পেল সামান্যই, এবং ওর জীবন যাত্রাটা আগের থেকে অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে গেল।

বাবলু আর চন্দ্রানী শৈশবে একই স্কুলে পড়তে লাগল এবং পাড়ার গলিতে আর পাঁচটা ছেলে মেয়ের সংগে ডাংগুলি আর এক্কা-দোক্কা খেলে মানুষ হতে লাগল। চন্দ্রানী যদিও বস্তির মেয়ে, বাবলুদের বাড়িতে তার অবারিত অধিকার ছিল। বাবলুর মা চন্দ্রানীকে নিজের মেয়ের মতোই মনে করতেন। আরতির আত্মসম্মান বোধ ছিল খুব তীব্র, সে বাবলুদের বাড়িতে বিশেষ আসত না। তবে মেয়েকে যেতে বাধা দিত না। বাবলুর মা ছিলেন স্কুল মিসট্রেস, আর আরতি নিজে হল, হাসপাতালের দাই।

শুভজিৎদের বাড়িটা অন্য রাস্তায়, ওদের বাড়ির পিছনে দিকের একটা সরু গলির ভিতর দিয়ে চন্দ্রানীদের গলিতে এসে পড়া যায়। শুভজিৎ যখন বি. এ. পড়ে, তখন একদিন কী কারণে সরু গলিটা দিয়ে চন্দ্রানীদের গলিতে

এসে পড়েছিল। এসে দেখল, বস্তিটার একটা ঘরের দাওয়ায় বসে দশবছরের একটা মেয়ে তারস্বরে চিৎকার করে একটা হিন্দি গান গাইছে, গানটির বয়ান হল, 'ও ময়য় কা কঁরু রাম, বুঝে বুড়ঢা মিল গয়া।' তারপাশে বসে সমবয়স্ক একটি ছেলে দুটো মাটির হাঁড়িকে বাঁয়া তবলা বানিয়ে মহা উৎসাহে পিটছে। শুভজিৎ ছেলে বেলা থেকে নাচ-গান-বাজনা সবই কিছু কিছু জানে। ওদের গান-বাজনা শুনে শুভজিতের একেবারে তাক লেগে গেল। ছেলেটির হাতের বাজনা যেমন পরিণত বয়স্ক একজন শিক্ষিত তবলচির মতো, মেয়েটির গলাও তেমনি অভিজ্ঞ সংগীতজ্ঞের মতো। সে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ওদের সংগীত চর্চা থেমে গিয়েছিল। চন্দ্রানী একবার চোখ তুলে ভয়ে ভয়ে শুভজিতের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর ঘরের ভিতরে চলে গেল। বাবলুর বাড়ি এ বাড়ির উল্টোদিকে, সে আড় চোখে শুভজিতের দিকে একবার চাইল, তারপর গুটি গুটি নিজের ঘরের দিকে চলতে সুরু করল। শুভজিৎ বাবলুর হাত ধরে আবার মাটির হাঁড়ির তবলার পাশে ওকে বসিয়ে দিল। চন্দ্রানীর মা ভিতরে রান্নার যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ ওদের সংগীতচর্চা বাধাগ্রস্ত হ'ল দেখে এবং চন্দ্রানীকে ভিতরে আসতে দেখে সে বাইরের দাওয়ায় বেরিয়ে এল। চন্দ্রানী পিছন পিছন এসে মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়াল।

একই পাড়ায় বসবাস করলে, সকলের সংগে সকলের অন্তত চোখের চেনা হয়ে যায়। আরতি শুভজিৎকে চিনতে পেরে হেসে বলল, 'আপনার কী দরকার ?' শুভজিৎ উত্তরে বলল, 'আপনি আমাকে, 'আপনি' বলবেন না, আপনাকে আমি চিনি, আপনি 'মৃতুঞ্জয়' হাসপাতালে কাজ করেন।' চন্দ্রানীর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিগ্যেস করল, 'ও কোথায় গান শেখে ?' আরতি হেসে বলল, 'কোথায় আর শিখবে ? আজকাল সব জায়গায় তা কলের গান, টিভি ; যেখানে যা শোনে, তাই শেখে।' শুভজিৎ একটু অবাক হল, জিগ্যেস করল, 'আর আপনার ছেলেটি ?' আরতি বলল,' ও আমার ছেলে নয়। ও বাড়িতে মিসেস চক্রবর্তী থাকেন, স্কুলে পড়ান, ও তাঁর ছেলে।' শুভজিৎ জিগ্যেস করল, 'ও-ও কি শুনে শুনে বাজাতে শিখেছে ?' আরতি বলল, 'তা ছাড়া আর কি ?' শুভজিৎ মনে মনে ভাবল, আমাদের দেশের কত প্রতিভা যে মাটির হাঁড়ির তবলার নিচে চাপা পড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তার খবর কে রাখে ? আরতির দিকে ফিরে বলল, 'আমি একটু গান বাজনার চর্চা

করি। আমাদের বাড়িতে ওদের নিয়ে যাব? আমার সংগে বসে ওরাও রেওয়াজ করতে পারবে।' সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। শুভজিতের সুন্দর মুখ দেখে আরতির ভাল লেগেছিল, এখন কথা শুনে আরো ভাল লাগল। সে বলল, 'চন্দ্রানী তো হুট্ হুট্ করে সব জায়গায় যাচ্ছেই। তুমি নিয়ে যাবে, তাতে আর বাধা কী? তবে বাবলুকে নিতে হলে মিসেস চক্রবর্তীকে জানিয়ো।'

এ প্রায় বারো তেরো বছর আগেকার কথা। তারপর থেকে বাবলু আর চন্দ্রানী ওদের বাড়ির মানুষের মতোই হয়ে গেছে। সবাই জানত, ওদের যদি বাড়িতে না পাওয়া যায়, তবে শুভজিৎদের বাড়িতে পাওয়া যাবে। শুভজিৎ নাচ গান বাজনা সবই অল্প বিস্তর জানত, সে চন্দ্রানীকে শাস্ত্রীয় সংগীতে হাতে খড়ি দিল। সেতার যতটা জানত, ততটাই শেখাল, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বাবলুকে তবলার অ-আ-ক-খ শিখিয়ে দিল। গান বাজনার জগতে ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের মানুষের সংগেও পরিচয় ছিল, অল্প খরচে অথবা বিনা খরচে ওদের জন্যে গানের এবং তবলার মাষ্টার ঠিক করে দিল। মাঝখানে আড়াই বছর শুভজিৎ বেনারসে ছিল, সে সময় চন্দ্রানী আর বাবলু নিতান্তই ছোট ছিল, শুভজিতের অনুপস্থিতিকালে ওদের জীবনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। শুভজিৎ ফিরবার পর ওদের আবার গিয়ে বাড়িতে নিয়ে এল; বাবলু ওকে 'শুভদা' বলে ডাকত, এবং নিজের বড়ো ভাইয়ের মতো ভালবাসত। চন্দ্রানী ওকে কোনো নাম ধরে ডাকত না, কিন্তু প্রথম বার শুভজিৎকে দেখবার পর থেকে ওর মনের মধ্যে প্রথম দিনের সেই গানটা গেঁথে গিয়েছিল, 'ও ম্যয় কা করু রাম, মুঝে বুড্ঢা মিল গয়া!'

শুভজিৎদের বাড়িতে তিমির যেদিন প্রথম চন্দ্রানীর গান শুনেছিল, সেদিন থেকেই ও চন্দ্রানীর গানের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। আজকাল 'পপ' গানের বাজার খুব ভালো, এবং তিমিরের কান হল সংগীত পরিচালকের কান, সে চন্দ্রানীর গলায় বিদেশী সংগীত শুনে বুঝেছিল, ওকে একদিন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী বানানো যাবে।

সেদিন তিমির এবং তার দুই সহকারী পি-টু এবং টোনি সকাল দশটার মধ্যে ষ্টুডিয়োতে এসে হাজির হয়েছে। আগামী ছবির জন্যে নতুন রেকর্ডিং হবে। নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র চারদিকে ছড়ানো রয়েছে, সবকটি যন্ত্র বাজিয়ে বাজিয়ে সুর মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। গায়কের দলের সকলেই

হাজির। একজন বাদে। যে এখনো আসেনি, সে হল চন্দ্রানী। আজ যে গানের রেকর্ডিং হবে, তাঁর প্রধান গায়িকা হল চন্দ্রনী। তিমির অধীর আগ্রহে চন্দ্রানীর প্রতীক্ষা করছে। তিমির ছাড়া দলের আর কেউ এখনো চন্দ্রানীকে দেখেনি। প্রধান গায়িকার রোল চন্দ্রানীকে দেওয়া হয়েছে দেখে দলের অন্য সকলে তিমিরের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। তাই নিয়ে ওদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। পিন্টু বলল, 'তিমিরদা, যাকে আমরা চিনি না, যার গলা মাইকে কখনো টেষ্ট করা হয় নি, তাকে আপনি প্রধান গায়িকার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন! যদি মাইক্রোফোনে গলা না খোলে?' তিমির বলল, 'না খুললে, ভাগিয়ে দেবো। আমার বিশ্বাস খুলবে। তখন দেখবে, কেমন আর্টিষ্ট যোগাড় করেছি।' তিমিরের 'পপ' গানের অভিজ্ঞতা অনেক দিনের। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, আধুনিক সংগীতের জগতে চন্দ্রানীকে নিয়ে একেবারে হইচই পড়ে যাবে। প্রযোজক বনওয়ারীও একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছে, কারণ ষ্টুডিয়ো ভাড়া করা হয় ঘণ্টা হিসাবে। পঁয়ত্রিশ মিনিট কেটে গেছে, এখনও মেয়েটার দেখা নেই। আর কারও কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু, খরচের টাকাটা যোগাড় করতে হবে বনওয়ারীকেই। সে 'ইনটার-কম'—এ তিমিরকে ডেকে বলল, 'তোমার ঐ নতুন গায়িকাকে বাদ দাও, এখানে যারা উপস্থিত আছে, তাদের একজনকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নাও। ঘন্টায় ঘণ্টায় ষ্টুডিয়োর ভাড়া কত করে বেরিয়ে যাচ্ছে, জানো?'

বনওয়ারীলাল বোথরা মাড়োয়ারী। সে নামেও মাড়োয়ারী, চেহারায় তো বটেই। কিন্তু জন্মসূত্রে কলকাতার মানুষ। বাংলা বলতে ও পারে, পড়তেও পারে। লেখবার অভ্যেস নেই। লেখবার অভ্যেস কজন বাঙালিরই বা আছে!

বনওয়ারীর অধৈর্য দেখে তিমির বলল, 'বনওয়ারীদা, আর একটু অপেক্ষা করুন, ও এখুনি এসে পড়বে। মেয়েটার গলা শুনুন আগে, তখন দেখবেন, আমাদের অপেক্ষা করা সার্থক হয়েছে। আমি বাজি রেখে বলছি।'

বনওয়ারী বলল, 'টেলিফোন করো না একবার! তাছাড়া রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কোথাও আটকে যেতে পারো? রাস্তাঘাটের যা অবস্থা আজকাল!'

তিমির বনওয়ারী উদ্দেশ্যে একবার ভেংচি কাটল। তারপর 'ইনটার-কম'-এ মুখ রেখে বলল, 'কাকে ফোন করব, দাদা? মেয়েটা থাকে বস্তিতে।

সেখানে কার ঘরে কটা টেলিফোন আছে ? মেয়েটা হল, যাকে বলে, 'গোবরে পদ্মফুল' !'

'ইনটার-কম' ছেড়ে দিয়ে উপস্থিত মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে বাজনার রিহার্সাল দিতে আরম্ভ করল তিমির। আর টেকনিশিয়ানের ঘরে প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে রইল বনওয়ারী। পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে এক খিলি পান মুখে পুরল সে। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল, অনুরাধা ঢুকছে।

যে সব আর্টিষ্টরা বনওয়ারীর কাছ থেকে মাস গেলে মাইনে পায়, অনুরাধা তাদের একজন। বনওয়ারীর সব বইতেই অনুরাধার ছোটখাটো একটা রোল থাকে। বয়স বাইশ তেইশ ; দেখতে শুনতে মোটামুটি। দেখতে যেমনই হোক, শরীরে যৌবনের জোয়ার। অনুরাধা এসে পিছন থেকে বনওয়ারীকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'বনওয়ারীদা, মায়াকে আপনি বাড়ির ছোট মেয়ের রোলটা দিলেন, আর আমাকে দিলেন ঝি-এর পার্ট ! সবাই বুঝছে, কার ওপর আপনার টান বেশি।'

বনওয়ারী ওর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'কী বলছ, অনুরাধা ? ছোট মেয়ের পার্টটা তো ফালতু, এ বইতে ঝি-এর রোলটাই তো আসল ! তাছাড়া, তোমার মাইনে মায়ার থেকে কত বেশি, বলো দেখি !'

অনুরাধা এসব ছেঁদো কথায় ঠাণ্ডা হবার মেয়ে নয়। সে বলে উঠল, 'ওসব কথা বাদ দিন। মায়া এখনও নতুন, তাই তার মাইনে কম। তিন বছর বাদে ওর মাইনেও আমার সমান হয়ে যাবে।'

বনওয়ারী অনুরাধার গালে গাল ঠেকিয়ে বলল, 'আরে, তাই কি কখনো হয় না কি ? তাছাড়া, কে কোন্ পার্ট করবে, সে ঠিক করা কি আমার কাজ ? পরিচালক তাহলে রয়েছে কী করতে ? তাকে মাইনে দিয়ে রেখেছি কিসের জন্যে ? আচ্ছা, চলো, চলো, ও ঘরে এসো, আমি দেখছি, কী করা যায় ?' বলে বনওয়ারী অনুরাধাকে প্রায় ঠেলে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। টেকনিশিয়ানের ঘরে বসে' অনুরাধার ঘনিষ্ঠতায় একটু অস্বস্তি হচ্ছিল বনওয়ারীর।

এদিকে বাজনার রিহার্সাল দিতে দিতে তিমির মুখ তুলে দেখল, সামনের দরজা দিয়ে চন্দ্রানী ঢুকছে। ওর মুখে একটা দোটানার ভাব। চন্দ্রানী শুভজিৎকে না জানিয়ে ষ্টুডিয়োতে এসেছে। মনে মনে ভেবেছিল,

তিমিরের অফারটা শুভজিৎকে এখন জানিয়ে কাজ নেই। আগে সব পাকা-পাকি হোক, তখন শুভজিৎকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু স্টুডিয়োর গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকবার মুখে চন্দ্রানীর মনটা ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত হল।

চন্দ্রানীকে দেখতে পেয়ে তিমিরের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে হাত নেড়ে ওকে ভিতরে ডাকল। ওদিকে, এত রকমের বাদ্যযন্ত্র এবং এতগুলি মানুষ দেখে চন্দ্রানী শুভজিতের কথা ভুলে গেল। ভীষণ নার্ভাস বোধ হতে লাগল ওর, গলা শুকিয়ে কাঠ হল। পেটের মধ্যে কী যেন মোচড় দিয়ে উঠল। মনে মনে ভাবতে লাগল, 'আমি পারবো তো!'

ব্যাণ্ড বাদকের দল নিজের নিজের যন্ত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চন্দ্রানী এবং তিমির দ্বৈতসংগীত গাইতে শুরু করল, এবং তাদের গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজাতে লাগল ব্যাণ্ড বাদকের দল।

যে সব টেকনিশিয়ানের দল গানটাকে রেকর্ড করছিল, তাদের মুখ চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। এমন ভালো গান তারা অনেকদিন রেকর্ড করে নি। সুর এবং তালের এমন সুন্দর সমন্বয় প্রায়ই দেখা যায় না। বিশেষ করে রাগ সংগীতের হাল্‌কা ছোঁয়া থাকলেও গানটি নিশ্চিতভাবে পশ্চিমী। সর্বোপরি চন্দ্রানীর গলা। সবাই বুঝল, ওর সুরেলা কণ্ঠস্বর গানটিকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

বনওয়ারী এতক্ষণ অনুরাধাকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ চন্দ্রানীর গানের রেস ভেসে এল ঘরের ভিতর। গানের সুর কানে যেতে অনুরাধার পিঠের উপর বনওয়ারীর হাত স্থির হয়ে গেল, কান খাড়া করে এক মিনিট সে গানটা শুনল, তারপর অনুরাধার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল সে। বনওয়ারীর মন অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে বুঝতে পেরে অনুরাধা তার বাহুবন্ধন দৃঢ়তর করে ওর গালের উপর মুখটা ঘষতে লাগল।

রেকর্ডিং-এর ঘরে চোখ বন্ধ করে গান গাইছিল চন্দ্রানী। তিমির ওর গলার সঙ্গে মাঝে মাঝে গলা মেলাচ্ছিল মাত্র। নামেই গানটি দ্বৈতসংগীত। চন্দ্রানীই আসল গায়িকা। গানের শেষ পঙ্‌ক্তিতে একটা মোচড় দিয়ে গান থামাল চন্দ্রানী। বাজনাও থেমে গেল। চন্দ্রানী এতক্ষণ অন্য জগতে ছিল, এবার সে চোখ খুলে চারদিকে চেয়ে দেখল।

ইতিমধ্যে বনওয়ারী এসে হাজির হল। সে এগিয়ে এসে চন্দ্রানীর কাছে নিজের পরিচয় দিল, তারপর ছদ্ম তিরস্কারে তিমিরকে জানাল, এমন একটা প্রতিভাকে তার কাছ থেকে এতকাল লুকিয়ে রাখা তিমিরের উচিত হয় নি। উত্তেজিত ভাবে তিমিরের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'এতদিন একে কোথায় রেখেছিলে, ব্রাদার? যাই হোক, বইটাতে একটা 'সোলো' গানও ঢুকিয়ে দিয়ো। চন্দ্রানী অন্তত একটা গান একা গাইবে।' বনওয়ারীর কথা শুনে চন্দ্রানীর মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

পরদিন সকালে মিঠুকে সেতার শেখাচ্ছিল শুভজিৎ। ওর পাশে বসে মাঝে মাঝে তবলায় চাঁটি মারছিল বাবলু। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে ঘরের মধ্যে এল বুদ্ধ। শুভজিতের দিকে চেয়ে বলল, 'দ্যাখো না, কে আসছে!'

শুভজিৎ চারদিকে চাইল একবার, কিন্তু নতুন কোনো মুখ দেখতে পেল না। জিগ্যেস করল, 'কে আসছে রে?'

বুদ্ধ ওর দিকে চেয়ে হাসছিল। সে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল, 'দ্যাখো না, কে আসছে!' অনেক সময় বুদ্ধের কথার কোনো অর্থ হয় না, সুতরাং শুভজিৎ সেতারের দিকে চোখ ফেরাল, মিঠুকে বলল, 'তুমি বাজাও।'

এক মুহূর্ত বাদে ঘরে প্রবেশ করল চন্দ্রানী। পরনে দামী শাড়ি, এবং হাতে গয়না। গয়নাগুলো কিছু নয়, আজকাল অনেক মেয়ের হাতেই নানা ডিজাইনের গিল্টির গয়না থাকে। কিন্তু ওর শাড়ির চেহারা দেখে বাবলুর চোখ ঝলসে উঠল। কিছুক্ষণ চন্দ্রানীর দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বাবলু বলে উঠল, 'বাপ্‌রে, করেছিস কি? তুই যে রাতারাতি বম্বের ফিল্মের নায়িকা হয়ে উঠেছিস্‌।'

বুদ্ধ একবার চন্দ্রানীর সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। চন্দ্রানীর মুখ লাল হল একটু, বুদ্ধ পর্যন্ত ওর বেশভূষার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে দেখে ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একবার শুভজিতের দিকে চাইবার চেষ্টা করল সে, তারপর গুরুদেবের ছবিটার সামনে গিয়ে হাত জোড় করল। এমন সময় ভুতু এসে হাত ধরে চন্দ্রানীকে ভিতরে নিয়ে গেল।

ক্ষণকালের জন্যে বাজনা থেকে শুভজিতের মনটা বিক্ষিপ্ত হল।

শুভজিৎ সাধারণত এ সব জিনিস বিশেষ লক্ষ্য করে না, কিন্তু চন্দ্রানীর আজকের বেশভূষা যার চোখে পড়বে না, সে অন্ধ। বাবলুর মনটাও চন্দ্রানী সম্পর্কে একটু সন্দেহগ্রস্ত হল। চন্দ্রানী ওর শৈশবের বন্ধু, ওর কাছে চন্দ্রানীর কোনো কিছু গোপন নেই। আজ ওর মনে হল, ওকে গোপন করে চন্দ্রানী বিশেষ কিছু একটা করতে চলেছে।

এমন সময় শুভজিতের ক্লাস ঘরে তিমির এসে উপস্থিত হল। এসেই সে জিগ্যেস করল, 'চন্দ্রানী কোথায় ?' তিমিরকে দেখে শুভজিতের মন একটু অপ্রসন্ন হল, বুঝল, চন্দ্রানীর বেশভূষার আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে তিমিরের যোগ আছে। সেকথা প্রকাশ না করে ও বলল, 'আপনি বসুন, আমি ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।' বলে, গলা তুলে ভুতুকে ডাকল। ভুতু এলে শুভজিৎ বলল, 'চন্দ্রানীকে ডেকে দে। বল্, তিমিরবাবু এসেছেন।' ভুতু একবার তিমিরের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর ছুটতে ছুটতে অন্দরের দিকে চলে গেল।

তিমির শুভজিতের দিকে ফিরে বলল, 'সুখবর আছে, মিষ্টি খাওয়ান।' একথার উত্তরে শুভজিৎ তিমিরের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তিমির বলল, 'আমরা এখন একটা নতুন ছবি বানাচ্ছি। চন্দ্রানী তাতে গান গাইবে বলে, কন্‌ট্রাক্‌ট্ সই করেছে। হাজার পাঁচ ছয় টাকা যাতে পায়, তা আমি দেখব।' টাকার অংক শুনে চমৎকৃত হল শুভজিৎ। মুখ তুলে দেখল, চন্দ্রানী এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছে। শুভজিতের মনের মধ্যে দু রকমের অনুভূতির সঞ্চার হল। চন্দ্রানীদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এ টাকা পেলে নিশ্চয়ই ওদের খুব সুবিধে হবে। কিন্তু মনে মনে সামান্য ঈর্ষাও বোধ করল শুভজিৎ। চন্দ্রানীকে ও নিজের হাতে মানুষ করেছে। ছবি বাজারে বেরোলে চন্দ্রানীর নাম ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। কিন্তু শুভজিৎকে আজও কটা লোকই বা চেনে। একবার চন্দ্রানীর দিকে ফিরে চাইল শুভজিৎ, দেখল সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওরই দিকে। শুভজিৎ অন্যদিকে চোখ ফেরালো। ঈর্ষার অনুভূতিটাকে জোর করে মন থেকে দূর করে দেবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু একটা বেদনাবোধ ওর মনকে আঘাত করতে লাগল বারবার। চন্দ্রানী ওকে কিছুই জানায় নি ! কেন ? কেন ? এত বড়ো একটা সংবাদ তিমিরের মুখ থেকে জানতে হ'ল কেন ওর ? চন্দ্রানী ওকে ঘুণাক্ষরেও জানাল না কেন ? অনেক কষ্টে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস দমন করে

ও নিজের শুকনো মুখে হাসি টেনে আনল, বলল, এতো খুব আনন্দের কথা! আমার থেকে সুখী আজ আর কে? কিন্তু, একটা কথা! চন্দ্রানী কি ওর গুরুর মত নিয়েছিল?' বলে আর একবার ফিরে চাইল চন্দ্রানীর দিকে। দেখল, চন্দ্রানী ওরই দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে, এবং ওর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ছে।

ঘরের আবহাওয়া দেখে তিমির একটু শঙ্কিত হল; বুঝল, ব্যাপারটা সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখুনি হয়তো কান্নাকাটির পালা সুরু হবে। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "শুভবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না; ও বোধহয় আপনাকে 'সারপ্রাইজ' দেবে ভেবেছিল।" শুভজিৎ আবার চন্দ্রানীর দিকে চেয়ে দেখল, তারপর হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'এদিকে আয়, তোর কান দুটো আজ মলে দিই।' শুভজিতের মুখে এমন আদরের তিরস্কার শুনে ওর কান্না আর বাধা মানল না, ছুটে এসে শুভজিতের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করতে চেষ্টা করতে লাগল চন্দ্রানী।

শুভজিৎ বলল, 'যা, উঠে গিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে আয়।'

চোখে-মুখে জল দিয়ে চন্দ্রানী যখন ঘরে ফিরে এল, তখনও ওর মুখ থেকে কান্নার চিহ্ন মিলিয়ে যায় নি। সবাই একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর তিমির শুভজিৎকে বলল, 'আজ সন্ধেয় বেঙ্গল ক্লাবে পার্টি আছে। আপনি আসুন। বাবলু, তুমিও এসো।' চন্দ্রানী এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছিল, সে কমলিকার দিকে ফিরে বলল, 'আপনিও ছেলেকে নিয়ে আসবেন।' কমলিকাকে একটু ইতস্তত করতে দেখে চন্দ্রানী আবার বলল, 'আপনাদের প্রেসে বাজানো উপলক্ষেই আমার নতুন কেরিয়ার-এর সূত্রপাত। তাতে যদি সফল হই, তবে তার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আমি ভুলব না। আজ সন্ধ্যেয় আপনাকে আসতেই হবে।' বলে সে একবার শুভজিতের দিকে চাইল।

যেদিন কমলিকাকে সেতার কিনে দিতে গিয়েছিল, সেদিনও বাড়ি ফেরবার পর, চন্দ্রানীর মনের কথা শুভজিৎ বোঝে নি, আজও বুঝল না। সে কমলিকার দিকে ফিরে বলল, 'তা, বেশ তো। বেঙ্গল ক্লাবে তিমিরবাবু ছাড়া, আমরা সকলেই নতুন। সকলেরই নতুন রকমের একটা অভিজ্ঞতা হবে। আপনিও চলে আসুন।'

কমলিকা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলল, 'মিঠুর বাবা এখন কলকাতায়। তাকেও

সঙ্গে আনব কি?' বলে জিজ্ঞাসু মুখে তিমিরের দিকে মুখ ফেরালো সে।

তিমির উদার ভাবে বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনারা তিনজনেই আসবেন।'

সাত

বেঙ্গল ক্লাবের বিরাট হল ঘরের চারপাশে জুড়ে লন। লনের ভিতর, জায়গায় জায়গায় ফুলের কেয়ারি। মধ্যে মধ্যে মাঝারি আকৃতির দশবারোটা টেবিল পাতা রয়েছে। প্রত্যেকটি টেবিল ঘিরে চারটে করে চেয়ার। কলকাতা শহরে 'নীল রক্তের' মানুষ বলে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের অনেকেই পার্টিতে জমায়েত হয়েছেন। হলঘরের একধারে বিরাট একটা টেবিল, 'তার উপর নানা ধরণের পানীয়ের সরঞ্জাম। তিমির উপস্থিত হতে, একজনকে বলতে শোনা গেল, 'আরে, তিমির যে, কতদিন দেখা নেই।' আরেকজনের কণ্ঠস্বর, 'তিমিরদা না? এবার কোন্ বইতে গান গাইছেন?' একজন আপাদমস্তক সাহেবী পোষাক পরা মানুষ বলে উঠলেন, 'হ্যালো টিমি, হোয়াট আর ইউ আপ টু?' তিমিরের সম্পর্কে এদের আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখে বোঝা যায়, সে ইতিমধ্যে রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বেঙ্গল ক্লাবের সমাবেশে তিমির আজ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। কলকাতার উপর মহলের মানুষজনের কাছে ও আজ চন্দ্রানীকে পরিচিত করে দিতে চায়। ও যে সত্যিকারের বড়ো একজন আর্টিস্টকে খুঁজে বের করেছে, সেটা সে গর্বের সংগে সকলকে জানাতে চায়। এই সমাবেশে নিজেকে একেবারে বেমানান মনে হচ্ছিল কমলিকার; সে মিঠুকে নিয়ে একটা টেবিলের পাশে বসে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এদের পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আদব-কায়দা সবই তার অচেনা। এরা সব কোথাকার মানুষ? কমলিকা ভাবল, এদের তো আগে কখনো দেখিনি! মনির মনোভাব কিন্তু কমলিকার মতো নয়। সে মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ; উপর মহলের মানুষজনের প্রতি তার একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত মোহ আছে। বেঙ্গল

ক্লাবের সমাবেশে আমন্ত্রিত হয়ে সে একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেছে। একটা বীয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে হাসি হাসি মুখে সে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। মনির হাতে গ্লাস দেখে কমলিকা বিরক্ত হল। মিঠুর শিক্ষাগুরু শুভজিতের সামনে স্বামীকে মদ খেতে দেখে অস্বস্তি বোধ করল সে। সে চোখের ইঙ্গিতে মনিকে নিজের কাছে ডাকল। তারপর অনুচ্চস্বরে তিরস্কার করে বলে উঠল, 'তোমার কী রকম আক্কেল বলো দেখি? শুভবাবুর সামনে মদ খাচ্ছ?' মিঠু বিস্মিত দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে কমলিকা বলল, 'মিঠু পর্যন্ত হাঁ করে' চেয়ে আছে! গেলাস রেখে দাও?'

শুভজিৎ অদূরে দাঁড়িয়ে তিমিরের সংগে কথা বলছিল। মনির প্রতি কমলিকার অনুযোগ ওর কানে গেল। সে তিমিরকে ছেড়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। কমলিকার দিকে চেয়ে বলল, 'কী হয়েছে তাতে? আমরা তো আর রোজ রোজ মদ গিলছি না। মাঝে মধ্যে এক আধদিন ড্রিংক করলে ক্ষতি কী?' কমলিকা একটু অবাক হল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

তিমির এসে ওদের টেবিলের লোকদের জন্যে আর একবার ড্রিংক্স্ ফরমাস করল। ওয়েটাররা তিমিরের আহ্বানে কৃতার্থ হয়ে গেল। 'লাভ ইন কালিম্পং' দেখে সকলে তিমিরকে চিনে গেছে। তাছাড়া, নতুন বছরের নাচের উৎসবে তিমির ক'দিন আগেই বেঙ্গল ক্লাবে এসে বাজিয়ে গেছে। তিমিরের ফরমাস মেটানোর জন্য ওয়েটারের দল ছুটোছুটি করতে লাগল।

এই সমাবেশ শুভজিৎ নিজেও বেমানান, কিন্তু একটা মধ্যবিত্ত-সুলভ অহংকার ওকে পেয়ে বসেছিল। মনে মনে ভাবছিল, আজ যারা বঙ্গেল ক্লাবে এসেছে, তাদের বেশির ভাগ মানুষের, বিত্ত কৌলীন্য ছাড়া আর কোনও গুণ নেই। ওর মনোভাব ওর মুখে চোখে প্রকাশ পাচ্ছিল। উপর থেকে নিচের দিকে চেয়ে দেখতে গেলে, মানুষ যে ভাবে তাকায়, সেই ভাবে চারদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে একটা বীয়ারের গ্লাস হাতে তুলে নিল শুভজিৎ।

চন্দ্রানী কোকাকোলার একটা গ্লাস হাতে নিয়ে কমলিকার সংগে কথা বলছিল এবং একবার তিমিরের দিকে, একবার শুভজিতের দিকে, ফিরে ফিরে দেখছিল। ওর জীবনে আজ এক বিরাট সন্ধিক্ষণ। পুরাতনকে বর্জন করে আজ নতুনকে আহ্বান করবার সময় এসেছে। কিন্তু মনটা দুটোকেই একই সংগে বজায় রাখতে চায়। পুরাতনকে ধ্বংস করে', তার মৃতদেহের উপরই যে নতুনের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, একথা চন্দ্রানী জানত না, কিন্তু ক্রমশ বুঝতে

পারছিল। নতুনকে পাবার একটা আনন্দ আছে ঠিকই, কিন্তু পুরনোকে হারাতেই হবে, এ চিন্তা ওর মনটাকে রক্তাক্ত করে দিচ্ছিল।

ড্রিংক করবার অভ্যেস নেই, কতটা সময়ে কতখানি বীয়ার খাওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও ধারণা নেই, তাই তাড়াতাড়ি দু গ্লাস বীয়ার খাবার ফলে শুভজিতের নেশা হয়ে গিয়েছিল। মদের নেশা কোনো কোনো মানুষকে চুপ করিয়ে দেয়, আবার কাউকেও মুখর বানিয়ে দেয়। ইংরাজিতে যাকে 'ইন-হিবিশন' বলে, মদ পেটে পড়লে অনেকেরই সেটা কেটে যায়। শুভজিৎ সাধারণত শামুকের মতো নিজের খোলসের মধ্যে থাকতে ভালবাসে, আজ ওর মনটা খোলস ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তিমিরকে ডেকে বলল, 'আজকাল আমি সেতার বাজাই বটে, কিন্তু ফাইন আর্টর্স-এ আমার হাতে-খড়ি হল নাচে। সেতার শিখেছি অনেক দেরিতে। দশ বছর বয়সের আগে আমি সেতারের তারে আঙুল ঠেকাই নি।'

কমলিকা নিজেও ছেলেবেলায় নাচ শিখত ; শুভজিৎ নাচ জানে শুনে ওর মনটা খুশি হল। চুপিচুপি চন্দ্রানীকে জিগ্যেস করল, 'তুমি ওর নাচ দেখেছ ?'

চন্দ্রানী মুখ টিপে ঘাড় নেড়ে উত্তর করল, 'হ্যাঁ।'

ওদের কথায় শুভজিতের কান ছিল না, সে তিমিরকে বলতে লাগল, 'লম্বা চুল নিয়ে আমার জন্ম হয়, ছেলেবেলায় পাড়ার দিদিরা আমাকে মেয়েদের সাজে সাজিয়ে দিত। বাবা আমাকে নাচ শেখাতেন। হাঁটতে শেখার আগে থেকেই আমি নাচতে জানি।' বলে হো হো করে হেসে উঠল শুভজিৎ। শুভজিতের হাসি কানে যেতে শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর পানে চেয়ে দেখল চন্দ্রানী। শুভজিৎকে ও কখনও এমন ভাবে হাসতে দেখেনি। শুভজিতের স্বভাব পরিণত বয়স্ক লোকদের মতো একেবারেই নয়, কিন্তু সাধারণত সে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। চন্দ্রানী ঘাড় ঘুরিয়ে একবার বাবলুর দিকে চাইল। বাবলু সব সময় ঠাট্টা ইয়ার্কি করে সকলকে মাতিয়ে রাখে, কিন্তু এই অচেনা পরিবেশে কি করবে বুঝতে না পেরে টেবিলের একপ্রান্তে চুপ করে বসেছিল। সে চন্দ্রানীর দিকে চেয়ে ঠোঁট ওল্টালো।

শুভজিৎ একবার মুখ ঘুরিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর তিমিরকে বলল, 'আসুন, আজ আমরা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের রিহার্সাল দিই,' বলে চন্দ্রানীকে আঙুল তুলে ডাকল।

তিমির 'পপ' গাইতে পারে, 'ডিস্কো' নাচতে পারে 'কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' ওর এক্তিয়ারের বাইরে। ও বলল, 'আপনারা করুন, আমি দেখি।' কয়েকজন ওয়েটার ওদের দিকে চেয়ে রইল।

শুভজিৎ বজ্রসেনের পার্ট বলতে লাগল, চন্দ্রানী হল উত্তীয়। কলকাতার সোসাইটির মানুষেরা নতুন রকম কিছু একট হচ্ছে দেখে ওদের দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে বসল।

মিঠু ওর গুরুকে নাচতে এবং গাইতে দেখে নিজেও অংশগ্রহণ করতে গেল; ওর নাচের অভ্যেস নেই, পায়ে পা জড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সকলেই ছুটে গেল মিঠুর দিকে, দেখল, ওর বিশেষ কিছু হয় নি। মাটিতে বসে পড়ে চারদিকে চেয়ে ও হাসছে। সকলে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেল! শুভজিৎ কমলিকার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি 'শ্যামা'র গানগুলো করুন না!' শুভজিৎ বজ্রসেন, তাই 'শ্যামার পার্ট নিতে হবে শুনে কমলিকার মুখ একটু লাল হল। তারপর হেসে বলল, 'আমি তো গানগুলো মুখস্থ বলে' যেতে পারি, ভাল গাইতে তো পারব না; শুভজিৎ বলল, "আমরা তো আর ষ্টেজে অভিনয় করছিনা। যা জানেন, তাতেই হবে।" কমলিকার গলা খুব উঁচু ধরনের না হলেও, বেশ সুরেলা, এবং সুর প্রায় নির্ভুল। শ্যামার গান-গুলো কমলিকার গলায় ভালই উৎরে গেল।

পার্টিতে সমবেত সকলেরই দৃষ্টি এদিকে, এবং সকলেই 'শ্যামা' নাটকের অভিনয় উপভোগ করতে লাগল। ওয়েটারের দলও একটু দূরে দাঁড়িয়ে, হাসি মুখে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। জনসমষ্টির মধ্যে একটি মাত্র লোক 'শ্যামা' নাটক সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে রইল, সে হল মনি। যতক্ষণ অভিনয় হল, ততক্ষণ সে বিরাট কাচের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে, হাতের বীয়ারের গ্লাসে মৃদু মৃদু চুমুক দিতে লাগল।

রাত প্রায় এগারোটা। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য শেষ হয়ে গেছে। সকলেই অল্পবিস্তর নেশাগ্রস্ত। ওয়েটার বিল নিয়ে এল। শুভজিৎ পকেটে হাত দিল। পকেটে হাত দিয়ে অবশ্য লাভ নেই, কারণ, পকেট গড়ের মাঠ। শুভজিৎ অবশ্য তার জন্য বিশেষ লজ্জা বোধ করল না।

তিমির বলল, এ টেবিলের বিল আমি মেটাচ্ছি, আপনারা ব্যস্ত হবেন না।' বিল মেটানো হয়ে গেলে ওরা রাস্তায় এসে নামল। তিমির শুভজিতের করমর্দন করে বলল, 'আপনার অভিনয় এবং গান খুব ভাল হয়েছে,

সোসাইটির লোকেরা সকলেই খুব উপভোগ করেছেন। আপনি একদিন আমার সংগে প্রযোজক বনওয়ারী লালের কাছে চলুন।'

শুভজিৎ হাসি মুখে তিমিরকে ধন্যবাদ জানাল, বলল, 'আচ্ছা!'

কমলিকা মনিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'শুভবাবুর হাতে বোধ হয় পয়সা নেই। চল, আমরা সবাই মিলে একটা ট্যাক্সিতে যাই, পথে ওদের নামিয়ে দিয়ে যাব।

মনি চিন্তিত মুখে বলল, 'তাতে আর অসুবিধে কি? মুস্কিল হল, ট্যাক্সি পেলে হয়।'

বাবা মায়ের কথা শুনে মিঠু বুঝল, শুভজিতের হাতে পয়সা নেই। সে বলে উঠল, 'শুভদা, তোমার বাস ভাড়া আছে তো?'

কমলিকা তাই শুনে জিব কেটে মনির দিকে তাকাল। বাবলু আর চন্দ্রানী হেসে ফেলল। শুভজিৎ এবং তিমির মিঠুর কথা শুনতেই পায়নি। তারা পরস্পরের সংগে কথা বলতে লাগল। কমলিকা মিঠুর দিকে চেয়ে মৃদু তীক্ষ্ন স্বরে বলল, 'বোকা ছেলে!'

চন্দ্রানীকে নিজের টীমে পেয়ে তিমিরের মন উদার হয়ে গিয়েছিল, সে জানত, শুভজিতের কাছ থেকে সে চন্দ্রানীকে এক রকম কেড়েই নিয়ে এসেছে। তিমির মনে মনে ভাবল, ওর উচিত শুভজিতের কিছু উপকার করা। কিন্তু অপরিমিত বীয়ার পান করে' সকলেই অল্পবিস্তর অপ্রকৃতিস্থ। কী বলতে, কী বলছে, তিমিরের খেয়াল ছিল না। সে শুভজিৎকে বলল, 'আপনি আমার সংগে বনওয়ারী বোথরার কাছে চলুন, আপনার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। আপনার বাজনার সংগে একটু 'পপ' পাঞ্চ করে দিতে পারলে তো আর কথা নেই। তিমির শুভজিতের উপকার করতেই চেয়েছিল, কিন্তু বলবার দোষে সব গোলমাল হয়ে গেল। শুভজিতের অপমান বোধ হল। সে মুখ লাল করে বলল, 'আপনার 'পপ' আপনারই থাক, আমার হিল্লে আপনাকে দেখতে হবে না। আপনার 'পপ' ভারতীয় সংস্কৃতির অপমান।'

তিমির শুভজিতের কথায় আহত হল। বলল, 'আপনি চোখ থাকতেও অন্ধ। আপনার মতো অন্ধ আমাদের দেশে আরও অনেক আছে। পাশ্চাত্যের শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে 'পপ' এর উৎপত্তি, এবং আমি আমার 'পপ' এর জন্যে গর্ববোধ করি। আমি আপনার সংগীত ভালো বুঝি না, কিন্তু আপনার সংগীতের ওপর আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আপনি আমার সংগীতের

'অ-আ-ক-খ' ও জানেন না, কিন্তু ভাবেন আপনি সবই জানেন এবং না জেনে ঐ সংগীত সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না। আমি আপনার মনোভাবের নিন্দা করি।'

তিমিরের তিরস্কারে লজ্জা পেল শুভজিৎ। ভেবে দেখল, তিমির অন্যায় কিছু বলে নি। সত্যিই তো, ও পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন সময় স্লথ গতিতে একটা ট্যাক্সিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মনি আর বাবলু হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সিটাকে থামাল, ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে তিমিরের দিকে ফিরে বলল শুভজিৎ, 'ঠিক আছে, 'পপ' গান সত্যিই আমি জানি না। আগে জানবার চেষ্টা করব, তারপর এ বিষয়ে আপনার সংগে কথা বলব।'

আট

কালিঘাটের মন্দির। মন্দিরের সামনে এক সাধু দাঁড়িয়ে, পরনে কৌপীন, খালি পা, মাথায় জটা, হাতে কমণ্ডলু। মুখে মোক্ষলাভের বাসনা। ওধার থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আকাশের দিকে মুখ ফেরাও। চোখ বন্ধ করো, তারপর বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করো।'

একটা ক্রেনের উপর ক্যামেরা সাজানো রয়েছে, ফিল্মের জন্যে ছবি তোলার কাজ চলছে। এমন সময় দেখা গেল, উজ্জ্বল পরিচ্ছদে আবৃত নর্তকীর দল সাধুর কাছে এগিয়ে গেল, নৃত্যের ভঙ্গীতে সাধুর চারপাশে একবার ঘুরে এল, তারপর সাধুর পায়ের কাছে ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করল। পাশ থেকে পরিচালকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কাট্। শটটা নেওয়া হল, ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হল।

সাধুর মুখ থেকে মোক্ষলাভের বাসনা দূর হল, তিনি লাইটার দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন এবং প্রযোজক বনওয়ারীলালের উদ্দেশে অগ্রসর হলেন।

আজ শটটা যখন নেওয়া হয়, তখন পাশের টেন্টে-এর মধ্যে আরো অনেকের সংগে শুভজিৎ ও উপস্থিত ছিল। ওর জগতের বাইরে অনেক জিনিস ঘটে, সে কথা যে ও জানেনা, তা নয়, কিন্তু সেগুলিকে ও আগে কখনও ঘনিষ্ঠ-

ভাবে চিনতে চেষ্টা করেনি। সেতার, তবলা এবং তানপুরা দিয়ে নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছিল ও, তার বাইরে ও কখনও পদার্পণ করবার চেষ্টা করেনি। সেদিন তিমিরের সংগে কথা কাটাকাটি হবার পর, ও ঠিক করেছিল, তিমিরের জগৎটাকে ও চিনতে চেষ্টা করবে। একটা বিষয় সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনে অন্ধের মতো আর মতামত প্রকাশ করবে না। ছবি তৈরির জটিলতা দেখে সিনেমা জগৎ সম্পর্কে ওর ঔৎসুক্য অনেক বেড়ে গেল, তিমিরের দিকে ফিরে শুধু বলতে পারল, 'বাঃ বেশ তো!' নৃত্য চঞ্চল দেবদাসীরা তাদের চপলতা বিসর্জন দিয়ে এই মুহূর্তে যে-সাধুর পায়ে ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করছিল, ক্যামেরা থামার সংগে সংগে সেই সাধুকে লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাতে দেখে ওর কৌতুক বোধ হচ্ছিল।

এমন সময় ধীর পায়ে বনওয়ারীলাল ওদের দিকে এগিয়ে এল। তিমির উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিল। শুভজিৎ চন্দ্রানীর গুরু একথা শুনে বনওয়ারী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'আপনি তো মশাই, একজন রেয়ার ট্যালেন্ট চন্দ্রানীর মতো মেয়ে যার হাতে গড়া, সে কখনোই যে সে লোক হতে পারে না।'

বনওয়ারীর বিনয় বাচনে শুভজিৎ মুগ্ধ হ'ল। বনওয়ারী বলতে লাগল, 'আপনিও আসুন, আমাদের সংগে যোগ দিন। এ লাইনে যে কত সম্ভাবনা আছে, তার শেষ নেই। আপনাদের মতো ইয়ং ব্লাডই তো দরকার।'

শুভজিৎ বনওয়ারীর কথার উত্তর দিল না, হাসি মুখে চুপ করে বসে রইল।

বনওয়ারী বলতে লাগল, 'দেখনু শুভবাবু, আমি অনেকদিন এই লাইনে ঘোরাঘুরি করছি। আমার বয়স আপনার ডবোল।' লোকের মনোরঞ্জন করাই সিনেমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমি টাকা বানাছি ঠিকই, কিন্তু আমার একটা আদর্শ আছে। সমাজের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। স্কুল-কলেজে ছেলে মেয়েরা যেমন শেখে, সিনেমা হাউসও তেমনি। আমরা যদি কুশিক্ষা দিই তবে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে।'

শুভজিৎ ঘাড় নেড়ে চুপ করে বসে রইল। বনওয়ারী বলতে লাগল, 'যে শটটা আজ আপনি দেখলেন, তাতে এক সাধুর চরিত্র আছে। এ গল্পে এটিই প্রধান চরিত্র। আমরা এমন সব গল্প থেকে ছবি বানাই, যা মানুষের

চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।' ভারতীয় ঐতিহ্যকে ছবিতে তুলে ধরবার জন্য আমি সচেষ্ট।

শুভজিৎ হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে জিগ্যেস করল, 'আপনি এমন ভাল বাংলা শিখলেন কোথায়?' ওর প্রশ্ন শুনে তিমির মুখ ফিরিয়ে হাসল। বনওয়ারীও হেসে ফেলল, তারপর বলল, 'আমি তো বাঙালিই। আমরা তিন জেনারেশন ধরে কলকাতার মানুষ। আপনি হয়তো জানেন না, আমার পিতাজি এক-কালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন, শুধু বিধান সভা নয়, মন্ত্রি-সভারও।'

রামনারায়ন বোথরা! তিনি শুভজিতের জন্মেরও আগে বেশ কিছু-কাল মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন, একথা ওর জানা ছিল, কিন্তু বনওয়ারীর সংগে যে তাঁর সম্পর্কে থাকতে পারে, এ কথা ওর মাথায় আসে নি। শুভজিৎ মাথা নেড়ে স্বীকার করল, বনওয়ারীর পিতার পরিচয় ওর অজানা নয়। বনওয়ারী বলল, 'আমি তিন পুরুষে বাঙালি, কিন্তু রাজস্থান যে আমার আদি বাসস্থান ছিল, তার জন্যে আমি গর্বিত! রাজস্হানে এককালে রাজ-সিংহ, রাণাপ্রতাপের মতো লোকেরা জন্মেছিলেন।' বনওয়ারী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তেমন লোক কি রাজস্হানে আর কোনোদিন জন্মাবে?'

শুভজিৎ বনওয়ারীর আক্ষেপোক্তি শুনে হেসে ফেলল, বলল, 'ও নিয়ে দুঃখ করে আর লাভ কি? রাজা মহারাজার যুগ তো আর নেই, এখন নতুন যুগের উপযোগী নতুন মানুষ জন্মাবে।'

বনওয়ারী কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'তা বটে। সেই জন্যেই বোধহয় দেশটা বেনিয়া বনে গেছে। অবশ্য, আজকের যুগ হল বেনিয়ার যুগ। দেখছেন না, আমেরিকা আজ কত ওপরে উঠে গেছে। বাঙালির বুদ্ধি আছে। প্রতিভা আছে। শিল্প বোধ আছে, বাঙালি যদি আজ মাড়োয়ারীর ব্যবসা বুদ্ধি আয়ত্ত্ব করতে পারে, তবে আবার সে মাথা তুলতে পারবে।

বনওয়ারীর সংগে কথা বলে, শুভজিৎ মুগ্ধ হল। ভাবল, দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাপরায়ণ এই সব মানুষের সত্যিই চিত্র শিল্পে আসা প্রয়োজন, তা হলে আর ছবি মারফৎ কুশিক্ষার ভয় থাকবে না।

বনওয়ারী কিছুক্ষণ শুভজিতের মুগ্ধ চোখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর

বলল, 'শুভবাবু, নতুন ছবির উদ্বোধন উপলক্ষে আমার গরীবখানায় একটা পার্টির আয়োজন করেছি, আপনি দয়া করে আসবেন।'

সেদিন শুভজিৎ ঘরে ফিরল মাথার মধ্যে এক রাশ চিন্তা নিয়ে। বনওয়ারীর কথা গুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে দেখল, মা ওর জন্যে বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছেন।

মা কি যেন বলতে গেলেন, অন্যমনস্ক শুভজিতের কানে তা গেল না। সে মাকে অতিক্রম করে ভিতরে চলে গেল।

মা ডেকে বললেন, 'আর দেরি করিস না, বেলা অনেক হয়েছে, যা হোক, দুটি খেয়ে নে।' মুখ হাত ধুয়ে শুভজিৎ যখন খাবার ঘরে এল, দেখল, মা থালা সাজিয়ে ওর জন্যে বসে আছেন। খাবার টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসতে বসতে শুভজিৎ বলল, 'বৌদি কোথায় ?'

মা বললেন, 'বৌমার শরীরটা ভাল নেই। সে শুয়ে আছে।' শুভজিৎ চিন্তিত মুখে বলল, 'সে কি ? আমায় বলো নি কেন ? কী হয়েছে ?'

মা অনুযোগ করলেন, 'তোর কোন জিনিসটা খেয়াল থাকে ? ঘরের মধ্যে থেকেও তুই ঘর ছাড়া। সারাদিন বাইরের একপাল ছেলে মেয়ে নিয়ে পড়ে আছিস্ !'

মায়ের অভিযোগের ধরণে শুভজিৎ সন্ত্রস্ত হল, ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল, 'বৌদির কী হয়েছে, তা বলবে তো !'

মা বিরক্ত মুখে বললেন, 'বেশ যা হোক ! ওর যে আজ বাদে কাল ছেলে হবে, সে খবর রাখিস্ ?'

শুভজিৎ হেসে বলল, 'তা কেন রাখব না ? হাসপাতালে যাবার সময় কে যাবে ? ভুতুর জন্মের সময় কে সব করেছিল, তুমি না দাদা ?'

মায়ের মুখ থেকে বিরক্তির চিহ্ন অপসৃত হল না, তিনি বললেন, 'তুই ছাড়া সে সব কে করবে ? রনুর সময় কোথায় ? সে তো ঘুম থেকে উঠেই নাকে মুখে দুটো গুঁজে বেরিয়ে পড়ে, তারপর বাড়ি ফিরতে তার সন্ধ্যে উৎরে যায়।'

শুভজিৎ বলল, 'ওসব কথা থাক। বৌদি এখন কেমন আছে, তাই বলো। আজই হাসপাতালে যেতে হবে কি ?'

মা উত্তর করলেন, 'না, আজই নয়। এখনও দেরি আছে। যাই হোক,

বৌমার কথা থাক। তুই নিজে এভাবে আর কতদিন কাটাবি, বল দেখি? একটা চাকরি টাকরি যোগাড় কর। বিয়ে থা করতে হবে না, না কি?'

মায়ের অনুযোগ শুনে হেসে ফেলল শুভজিৎ, একবার বনওয়ারীর কথা মনে পড়ল। তারপর বলল, 'মা, তুমি তো জানো, চাকরি আমার ধাতে পোষাবে না। মনে হচ্ছে, কিছু দিনের মধ্যেই ভাল রোজগারের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তখন আর শুধু টিউশনির টাকার ভরসায় থাকতে হবে না।'

মা শুভজিতের আসন্ন ভাগ্যোদয়ের আশায় আশান্বিত হলেন। বললেন, 'তা হলে এবার তোর বিয়ের চেষ্টা দেখি। মীরার মা সেদিন একটা ভাল পাত্রীর সন্ধান দিয়েছেন।'

শুভজিৎকে সংসারী করবার ব্যাপারে মায়ের আগ্রহ দেখে ও হেসে ফেলল। একপাশে ঠেলে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আর কটা দিন যেতে দাও। মীরার মা এতদিন অপেক্ষা করেছেন, আর কটা দিনও অপেক্ষা করতে পারবেন। এখন বিয়ে হলে তোমার বৌ এসে শোবে কোথায়?'

শুভজিৎ হাত ধুতে কলঘরের দিকে গেল, মা বসে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। পুত্রের মঙ্গলকামনায় অনেকদিন বাদে তাঁর মৃত স্বামীর কথা মনে পড়ল।

খাওয়া দাওয়ার পর শুভজিৎ বাইরের ঘরে গিয়ে সতরঞ্চির উপর বসে পড়ল। একটুকাল এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, তারপর সেতারটা কোলে তুলে নিল।

কিছুক্ষণ ধরে সেতার বাজাল শুভজিৎ, নানা ভাবে। মৃদুতা বর্জন করে, বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ চলল বাজিয়ে। একবার তবলা-জোড়ার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর সেতারটাকে আবার শুইয়ে রাখল মেজেতে।

শুভজিতের আজ প্রথম মনে হল, এ বাজনা হল আত্মকেন্দ্রিক বাজনা। আবার সে সেতারটাকে তুলে নিল কোলের উপর, কোমল করে, মৃদু করে, বাজাতে চেষ্টা করল সে। এমন ভাবে বাজাতে হবে, যাতে সকলের মনকে স্পর্শ করে। শুধু নিজের আনন্দের জন্যে বাজালে হবে না, সকলের জন্যে আনন্দের আয়োজন করতে হবে। কয়েকটা ছোট ছোট সুর বাজিয়ে দেখল। এগুলো কি সিনেমার ছবিতে ব্যবহার করা যাবে? সমস্ত বিকেলটা সে

যেন সেতার নিয়ে সংগ্রাম করতে থাকল। এ সংগ্রামে ওকে জয়ী হতেই হবে !

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তো আছেই, তাছাড়া আরও কত রকমের সুর যে আছে, তা বলবার নয়। কীর্তন আছে, বাউল আছে, ভাটিয়ালি আছে, তাছাড়া বিদেশী সুরও আছে। নানা রকম সুর নানা ভাবে মিলিয়ে বাজাবার চেষ্টা করতে লাগল সে। শুভজিৎ আজ আর নিজেকে গুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করল না, নিজেকে সে মেলে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। যে ভাবেই হোক, যত পরীক্ষা নিরীক্ষারই প্রয়োজন হোক না কেন, আজ ওকে শামুকের খোলস ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়তেই হবে।

আবার তবলা জোড়ার দিকে চোখ পড়ল শুভজিতের। সেতার বন্ধ করে, তবলা জোড়ার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। এমন সময় দরজার সামনে ভুতুকে দেখা গেল।

শুভজিৎ ওকে ডাকল, 'এদিকে আয়।'

ভুতু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, শুভজিৎ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তবলার সামনে এসে বোস্।' সেতারে একটা বোল তুলে ভুতুকে বলল, 'বাজা তো দেখি তবলায়।'

ভুতু বলে উঠল 'ও বাবা! ও আমি পারব না।'

শুভজিৎ জোর করে বলল, 'ঠিক পারবি। আমি তো তোকে তবলা বাজাতে শিখিয়েছি।'

ভুতু বাঁয়া তবলার সামনে গিয়ে বাজাতে চেষ্টা করল, কিন্তু তবলাতে বোলটা ঠিকমতো উঠল না। শুভজিৎ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোকে এতদিন ধরে যে শেখালাম, কিছুই শিখিস্ নি? যা ঠাকুমার কাছে যা।'

ভুতু পারতপক্ষে কারো কাছ থেকে কখনও বকুনি খায় না। সে একটু অবাক হল, তারপর মুখ চুন করে উঠে গেল।

সমস্ত বিকেল শুভজিৎ একমনে বাজিয়ে চলল সেতার। নানা ছন্দে, নানা রাগে। ভুতু মাঝে মাঝে দূর থেকে উঁকি দিয়ে দেখে গেল। শুভজিৎ লক্ষ্য করল না। শ্রান্তিতে ওর সমস্ত কপাল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। কয়েক ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়ল ওর কোলের ওপর।

মাঝে মাঝে ওর মনে হতে লাগল, সুরগুলোকে ও ঠিক মতো জুড়তে পেরেছে, তবু কিছুতেই ওর মনের মতো হচ্ছে না; কতবার মনে হল, নতুন

সুরের সৃষ্টি হয়তো হয়েছে, কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। সন্ধ্যে হয়ে গেল, সুরের পর সুর গেঁথে চলল শুভজিৎ, কিন্তু কিছুতেই ওর মনের তৃপ্তি হল না।

'পপ' সংগীতকে যত খেলো এবং সহজ ভেবেছিল সে, বাজাতে গিয়ে তার মনে হল, তত সহজে নয়। 'পপ' সংগীতের চ্যালেঞ্জের সামনে নিজেকে এক একবার পরাজিত বলে মনে হতে লাগল শুভজিতের। নিজেকে বড় অসহায় বোধ হতে লাগল।

ঘণ্টা তিনেক কেটে যাবার পর হঠাৎ সেতার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শুভজিৎ। দুহাত দিয়ে শরীরটাকে আবৃত করে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। দরজার বাইরে আবার ভুতুর মুখ দেখা গেল। এতক্ষণে চেতনা ফিরে এল ওর। চটিজোড়া পায়ে গলাতে গলাতে ভুতুকে বলল, 'মাকে বলিস্, আমি একটু ঘুরে আসছি।' তারপর ভুতুর মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে ও বেরিয়ে গেল।

বাবলু গত দুদিন ধরে আসে নি, মনে পড়ল শুভজিতের। দুদিন ধরে অন্য একটা জগতে ঘোরাফেরা করছিল ওর মন, বাবলুর কথা মনে পড়ে নি। মনে হল, তবলার সঙ্গত না হলে তারের যন্ত্রে সুর সৃষ্টি হবে কী ভাবে? এক মিনিটের মধ্যে বাবলুদের দরজার সামনে গিয়ে হাজির হল শুভজিৎ। দরজায় কড়া নাড়ল কয়েকবার। ভিতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অধৈর্য শুভজিৎ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো।

বাড়ির উঠোনে পেঁৗছে দেখল, বারান্দায় মাদুরের উপর দুটি মানুষ বসে আছেন, একজন বাবলুর মা, মিসেস চক্রবর্তী, এবং অপর জন শুভজিতের প্রতিবেশী, মানিক বিশ্বাস। দুজনের মাঝখানে একটা কোষ্ঠীর ছক বিছানো রয়েছে। ছকের দিকে চোখ রেখে বাবলুর মায়ের উদ্দেশ্যে কথা বলছে মানিক। শুভজিৎ বুঝল, মানিক বাবলুর ছক বিচার করছে। দুজনের মনই অন্য জগতে। তাই, কড়া নাড়ার আওয়াজ কারো কানে যায় নি।

শুভজিৎকে ভিতরে আসতে দেখে মানিকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ওকে ডেকে বলল, 'এসো, ভাই, এসো। বলো কী খবর?'

শুভজিৎ একটু হাসল, 'চলে যাচ্ছে একরকম। আপনি কী করছেন? কোষ্ঠীবিচার?'

মানিক শুভজিতের কথার উত্তর দিল না, মিসেস চক্রবর্তীর দিকে ফিরে

বলল, 'সুধাদি, এই ছোকরার কোষ্ঠীও খুব ভাল। এক বছর সময়ের মধ্যে ওর জীবনে বিরাট এক পরিবর্তন আসছে। আমি ওকে গোমেদ পরতে বলে দিয়েছি।'

তারপর শুভজিতের দিকে ফিরে বলল, 'শুভ, তুমি গোমেদ যোগাড় করেছ?' শুভজিৎ হেসে ফেলল, বলল, 'গোমেদ কোথায় পাবো? বাজনার টিউশানি করে পেটের ভাত জোটাতেই হিমসিম খাচ্ছি, তার ওপর আবার গোমেদ!'

মানিক উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এইসা দিন নেহি রহে গা। গুলি মারো তোমার টিউশানির। তোমার ভাল দিন এসেই গেছে, বুঝলে! শুধু গোমেদটা পরবার ওয়াস্তা। তোমাকে দিয়ে হবে না; আমিই গোমেদ জোগাড় করে দেবো সস্তায়। গোমেদ পরলেই চড় চড় করে কপাল খুলে যাবে।'

শুভজিৎ মানিকের কথার উত্তরে শুধু একটু হাসল। বুদ্ধের জন্মের পর থেকে মানিকদা কেমন আস্তে আস্তে ভাগ্যবাদী হয়ে গেল, মনে পড়ল ওর। বলল, 'বেশি দাম হলে নিতে পারব না, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।'

মানিক দৃঢ়স্বরে বলল, 'ধারে কিনিয়ে দেবো। এখন দাম দিতে হবে না। গোমেদ পরবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থযোগ আছে, তখন দাম দিয়ো।'

শুভজিৎ আবার হাসল, তারপর মিসেস চক্রবর্তীকে জিগ্যেস করল, 'মাসিমা, বাবলু কোথায়?'

সুধা বললেন, 'দুর্গাপুরে ওর কাকার বাড়িতে গেছে।'

শুভজিৎ একটু অবাক হ'ল, তারপর বলল, 'ফিরবে কবে?'

সুধা উত্তর করলেন, 'তা তো কিছু বলে যায় নি।'

শুভজিৎ আবার জিগ্যেস করল, 'কেন গেছে, কিছু জানেন কি?'

সুধা বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'কবে থেকে বেচারা বেকার বসে আছে; আমার সঙ্গে তো আজকাল বিশেষ কথাবার্তাও বলে না। সেদিন ওর কাকার একটা চিঠি এল। চিঠি হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাড়ির দিকে ছুটল। কেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি?'

শুভজিৎ বলল, 'না তো! আমি বোধহয় বাড়ি ছিলাম না!'

সুধা আবার বললেন, 'তোমাদের বাড়ি থেকে ফিরেই বলল, আমি আজ রাতের গাড়িতে দুর্গাপুর যাচ্ছি। দু দিনের মধ্যেই ফিরবো। আমি

বললাম, তুই যাচ্ছিস্ কেন? কাকা চিঠিতে কী লিখেছেন? ও বলল, সব ঠিক আছে, কাকা ভাল আছেন, ফিরে এসে সব কথা হবে। আমার মনে হয়, ও আজকালের মধ্যেই ফিরবে।'

শুভজিৎ দরজার দিকে পা বাড়াল, তারপর বলল, 'আমি আজ আসি। বাবলু ফিরলেই ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। বলবেন, ভীষণ দরকার।'

বাবলু থাকলে ওকে নিয়ে আবার সেতারের সামনে গিয়ে বসতে পারত শুভজিৎ। কিন্তু তা হল না। ওর মনের অস্থিরতা বেড়েই চলল। বাবলুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চন্দ্রানীদের বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল একবার। চন্দ্রানীদের দরজায় তালা ঝুলছে। চন্দ্রানীর সঙ্গে আজকাল বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হয় না। বোধহয় তিমিরদের গানের আড্ডায় গেছে। ওদিকে, আরতিদিরও আজ বোধহয় ইভনিং ডিউটি, এখনও হাসপাতাল থেকে ফেরেন নি। শুভজিতের বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে হল না; সে অস্থির মনে গঙ্গার দিকে পা চালিয়ে দিল।

নয়

কমলিকার কয়েকদিনের ছুটি পাওনা ছিল। ছুটি কাটিয়ে একেবারে পাঁচদিন বাদে, এক সোমবার ও বীনাবাদিনী প্রকাশনীতে এল। বাড়িটার ভেতর ঢুকতে গিয়ে হকচকিয়ে গেল কমলিকা। চারদিকে ছুতোর মিস্ত্রি এবং রাজমিস্ত্রির দল কাজ করছে। একশো বছরের পুরনো বাড়িতে অনেককাল আগে প্রেস বসানো হয়েছিল। বর্তমানে বাড়িটার চারদিক থেকে চুণ বালি খসে খসে পড়ছে। পীযূষের উৎসাহে বাড়িটার চাকচিক্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু বাইরেই নয়, ভিতরেও নানা ধরনের পরিবর্তন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে, জায়গায় জায়গায় কিউবিক্‌ল্ বসানো হয়েছে। প্রেসটার চেহারা ছিল একেবারে রক্ষণশীল, তাকে রাতারাতি একেবারে আল্ট্রা-মডার্ণ বানানো হচ্ছে।

কমলিকা মনে মনে ভাবল, বর্তমান পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও

দুটো কাজ করা দরকার। প্রকাশন ভবনের নামটাও পালটানো দরকার। 'বীনাবাদিনী' নাম এখন অচল হয়ে গেছে। আর একটি বস্তু হলেন কাকাবাবু নিজে। 'বীনাবাদিনী' নাম হয়তো একদিন পালটানো যাবে, কিন্তু কাকাবাবুকে পালটাবে কে ?

কাকাবাবু ওকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। কমলিকা গিয়ে দেখল, উনি যথাস্থানে আছেন, এবং তাঁর পাশে একটা চেয়ারে পীযূষ বসে আছে। কাকাবাবুর চোখমুখ উত্তেজনায় চকচক করছে। উনি বক্তৃতার ভংগীতে বললেন, 'যখন আমি প্রেসের ব্যবসা আরাম্ভ করেছিলাম, তখন কে ভেবেছিল, সেই ছোট্ট চারাগাছ আজকের এই বিরাট মহীরূহে পরিণত হবে।'

আধুনিক যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অফিসটাকেও আধুনিক বানানো হচ্ছে। 'নতুন যুগের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে তো, কি বলো ?' বলে উনি কমলিকার মুখের দিকে চাইলেন। কমলিকা কাকাবাবুর পোশাক পরিচ্ছদের দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে দেখল, তারপর মুখ টিপে বলল, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

কাকাবাবু বললেন, 'সব পীযূষের আইডিয়া। আমাদের দিন চলে গেছে। এখন তোমাদেরই দিন। পীযূষ রেকমেণ্ড করেছে, সামনের মাস থেকে তোমার মাইনে তিরিশ টাকা বাড়ানোর জন্যে। আমি রাজি হয়েছি। তুমি ভাল কাজ করছ, আমি দু-এক মাসের মধ্যে তোমার প্রমোশনের ব্যবস্থাও করব।

কমলিকা খুশি হল ; কীভাবে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, বুঝতে পারছিল না ও। শেষে কোনোমতে বলে ফেলল, 'আপনাকে আর কি বলব ?' আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রমোশনের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কোন্ নতুন দায়িত্ব কমলিকার উপর পড়বে, পীযূষ ওকে তাও বুঝিয়ে দিল। পীযূষকেও ধন্যবাদ জানিয়ে কাকাবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল কমলিকা।

স্বপন এসে কমলিকার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসল ; কমলিকা ওর দিকে ভুরু তুলে চাইল, বলল, 'কি ব্যাপার ? তোমার আজ কোনো কাজ-কর্ম নেই না কি ?'

স্বপন বলল, 'আছে ; দাঁড়ান, অনুকূলকে দু কাপ চা আনতে বলে দিই ?' স্বপন ফিরে এলে, কমলিকা বলল, 'কী বলবে, বলো ? তোমার

প্রেম আর কতদূরে এগোলো ? বছর তিনেক তো হল, এবার এস্পার ওস্পার কিছু একটা করো !'

স্বপন মুখটা করুণ করে বলল, 'কমলাদি, দুঃখের কথা আর কী বলব ? বান্ধবী বলেছে, আমায় তালাক দেবে !'

কমলিকা বলল, 'আগে বিয়েটা করোতো, তবে তো সে বেচারা তালাক দেবার সুযোগ পাবে ? গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ?'

স্বপন বলল, 'আজকাল আর সেদিন নেই কমলাদি ? পাশ-টাশ করে একটা ভদ্ররকমের চাকরি জোটাতে আজকাল বছর দশেক লেগে যায় ? তারপর ঘরে যদি অবিবাহিত বোন থাকে, তাকে পার করতে আরো দশটা বছর। বছর চল্লিশেক বয়েসে কষ্টে সৃষ্টে বিয়ে করবার সুযোগ মেলে। তারপর কি আর তালাক-টালাকের বিলাসিতা পোষায় ? আজকাল তাই বিয়ের আগেই তালাকের ব্যবস্থা।'

স্বপনের করুণ মুখ দেখে সবাই হেসে ওঠে। কমলিকা বলল, 'বুঝলাম। তা যাই হোক, বান্ধবীর হঠাৎ তালাক দেবার বাসনা হল কেন ? বাড়ি থেকে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে না কি ? না, ইতিমধ্যে শাসালো আর কোনো খদ্দের জুটিয়ে ফেলেছে ?'

স্বপন করুণ স্বরে বলল, 'ছি, ছি, কমলাদি, আপনি গুরুজন হয়ে এসব কথা আমাকে বলেন !'

স্বপনের কথায় সকলেই হেসে উঠল আবার। কমলিকা বলল, 'অনেক কাজ পড়ে আছে, আর ইয়ার্কি নয়। কী বলতে এসেছো, বলো ?'

স্বপন বলল, 'ভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে ?'

কমলিকা সবার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল, বলল, 'এবার তুমি আমার হাতে সত্যিই থাপড় খাবে।'

স্বপন গলা খাটো করে কমলিকার কানের কাছে মুখ এনে হ্রস্বকণ্ঠে বলল, 'কাকাবাবু ভালো মানুষ। পীযূষদা কাকাবাবুকে ঠকাচ্ছে।'

কমলিকা কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল স্বপনের দিকে। তারপর বলল, 'তোমার বান্ধবীর বাপকে ঠকায় নি তো ?'

স্বপন গম্ভীর মুখে উত্তর করল, 'আমি ঠাট্টা করছি না, কমলাদি।'

কমলিকা জিগ্যেস করল, 'তুমি কোথা থেকে খবর পেলে ?

স্বপন বলল, 'আপনাকে পরে বলব। আমার বিশ্বাস, খবরটা মিথ্যে নয়।'

কমলিকা বলল, 'আমাদের তো তাহলে কাকাবাবুকে বাঁচাবার চেষ্টা করা উচিত !'

স্বপন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দাঁড়ান, খবরটা পাকা কিনা, আগে সেটা বুঝে নিই। তারপর যদি কিছু করবার দরকার মনে হয়, করবেন।'

সারাদিন ধরে ছাপানোর মেশিনগুলো দিস্তে দিস্তে কাগজ ছাপিয়ে চলল। কর্মচারীর দল ছাপানো কাগজগুলো পর পর সাজিয়ে বাঁধাই ঘরের দিকে চালান দিল। পাঁচটা বাজতে না বাজতে কর্মচারিরা মেশিন বন্ধ করে হাত মুখ ধুতে কলঘরের দিকে গেল। কমলিকা ক'দিন ছুটিতে ছিল, ওর টেবিলে অনেক কাজ জমে গিয়েছিল। কাজ শেষ করে নিজের ঘর থেকে দেখল, গৌতম, স্বপন, মুরারি, সবাই চলে গেছে। মেশিনের কর্মচারিরাও কেউ আর বসে নেই। সমস্ত প্রকাশন ভবন একেবারে ফাঁকা। সে দরজা ঠেলে বাইরে বেরোতে গিয়ে হকচকিয়ে গেল, দেখল, পীযূষ দাঁড়িয়ে। স্বপনের কথাগুলো এতক্ষণ বাদে আবার মনে পড়ে গেল কমলিকার। দেখল, পীযূষ ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মনে হল, পীযূষ যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের রেখা পড়বার চেষ্টা করছে। স্বপনের সঙ্গে ওর যে কথা হয়েছে, পীযূষ কি তা জানতে পেরেছে ? দরজার ঠিক বাইরে পীযূষ দাঁড়িয়ে আছে কেন ? পীযূষের হাবভাব দেখে মনে হল, ও কী যেন বলতে চায়। কমলিকা একবার ইতস্তত করল, তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, 'আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন ?'

পীযূষের মুখের ভাব স্বাভাবিক হল, সে হালকা স্বরে বলল, প্রেস একেবারে ফাঁকা। এমন কি যে কর্মচারিরা ছাপায়, তারাও চলে গেছে। আপনিও এবার বাড়ি যান।'

কমলিকা পীযূষের মুখের দিকে এক মিনিট চেয়ে রইল, পীযূষের মনে বিশেষ কোনো কথা আছে কিনা বুঝবার চেষ্টা করল, তারপর চলল, 'হ্যাঁ, এবার যাই। আপনি যাবেন না ?'

পীযূষ বলল, 'আমার এখনও আরো ঘণ্টা খানেক থাকতে হবে। আপনার খবর সব ভাল তো ? ছেলের সেতার শেখা কতদূর এগোলো ?'

কমলিকা হেসে বলল, 'এগোচ্ছে একটু একটু করে। এতো একদিনে শিখে ফেলবার জিনিস নয়। অফিস থেকে ফিরেই ওকে নিয়ে বেরোতে হবে আবার।'

কমলিকা একবার হাত নাড়ল পীযূষের দিকে, তারপর রাস্তার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

কমলিকার বন্ধু মিতালি ইতিমধ্যে মিঠুকে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে গেছে। মিতালির বাড়িটা মিঠুর স্কুলের কাছেই, এবং শুভজিতের বাড়ি থেকেও বেশি দূর নয়। যেদিন মিঠুকে নিয়ে ওর শুভজিতের বাড়ি যাবার কথা থাকে, সেদিন মিতালি স্কুল থেকে মিঠুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে।

কমলিকাকে দেখতে পেয়ে মিঠু ছুটে এল, বলল, 'আজ তোমার এত দেরি হল কেন, মা ? আমার খিদে পেয়েছে।'

কমলিকা বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে রে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল্‌। শুভবাবু তোর জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন।'

যাবার পথে আইসক্রীমের দোকান। মিঠু বলল, খিদে পেয়েছে, আইস-ক্রীম খাবো।'

কমলিকা একবার হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, তারপর মিঠুর হাত ধরে আইসক্রীমের দোকানে ঢুকল।

দোকানদার নরেশ মিঠুর বন্ধু। সে একগাল হেসে বলল, 'খোকাবাবু আজ তোমার কোনটা চাই ?'

মিঠু সব রকম আইসক্রীমের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর বলল, 'আমাকে ঐ লাল রঙেরটা দাও।'

কমলিকা বলল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।' মিঠু আইসক্রীম চুষতে লাগল।

কমলিকা যখন শুভজিতের ক্লাস ঘরে এসে পৌঁছল, তখন ঘরের ভিতর অন্ধকার হয়ে গেছে। বাইরে তখনও আলো রয়েছে। ঘরের মধ্যে একলা বসে শুভজিৎ সেতার বাজিয়ে চলেছে। প্রতিদিনের মতো তবলার সামনে আজ বাবলু উপস্থিত নেই। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে, শুভজিতের খেয়াল নেই। কমলিকা সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

শুভজিৎ সেতার বাজাতে বাজাতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল। শুভজিতের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল, সে ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলল, এবং একমনে বাজিয়ে চলল।

সেতার বাজছে কিন্তু তার সঙ্গে তবলার সঙ্গত নেই, তাই বাজনাটাকে অসম্পূর্ণ মনে হতে লাগল কমলিকার। তবলায় যে বোলগুলি দিলে

বাজনাটা সম্পূর্ণ হয়, সেগুলি মুখে আওয়াজ করে করে দিতে লাগল কমলিকা।

শুভজিতের মুখে হাসি ফুটে উঠল আবার। সে বাজাতে বলল, 'মুখে কেন? বাঁয়া তবলাই তো রয়েছে। বাজান না?'

কমলিকা মাথা নেড়ে বলল, 'বাজনাটা মোটামুটি বুঝি, কিন্তু হাতে বাজাতে জানি না।'

শুভজিৎ বাজাতে বাজাতে বলল, 'তবে মুখেই বাজান।'

কমলিকা. গান বাজনার আইন কানুন বিশেষ জানে না, কিন্তু তার সুর বোধ আছে।

সে মনে মনে অনুভব করল, শুভজিৎ এমন একটা সুর সেতারে তুলবার চেষ্টা করছে যেটা আগে কেউ কখনো সেতারে তোলেনি। বুঝল, নতুন কিছু একটা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে শুভজিৎ। এই সুরের সঙ্গে তবলার সঙ্গত করতে পারছে না বলে মনে মনে আক্ষেপ করল কমলিকা। মুখের আওয়াজে এবং টেবিলের ওপর আঙুলের টোকা দিয়ে দিয়ে সেতারের বাজানাটাকে যথাসম্ভব সহায়তা করতে লাগল সে। নতুন সৃষ্টির একটা উন্মাদনা আছে, সেই উন্মাদনার স্পর্শ লাগল ওর মনে।

এমন সময় দপ্ করে আলো নিবে গেল। 'লোডশেডিং'। শুভজিৎ সেতার থামিয়ে বলল, 'কোনের তেপায়াটার ওপর মোমবাতি আর দেশলাই আছে। একটা জ্বালান্!'

বাইরে তখনও দিনের শেষ আলোর রেশ মিলিয়ে যায় নি। ভুতু পাড়ার আর দুটি সমবয়স্ক মেয়ের সংগে উঠোনের চত্বরে এক্কা দোক্কা খেলছিল। আলো নিবে যেতে ও বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, 'মিঠু, আলো নিবে গেচে, বাইরে আয় না, আমাদের সংগে খেলবি।' মিঠু বসে বসে এতক্ষণ শুভজিতের বাজনা শুনছিল, এবং ক্রমশ অধৈর্য হচ্ছিল। সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

কমলিকা অন্ধকারে উঠে গিয়ে তেপায়ার উপর হাতড়ে হাতড়ে মোমবাতির প্যাকেট এবং দেশলাই-এর সন্ধান পেল, এবং প্যাকেট থেকে একটা মোমবাতি বার করে জ্বালল। আলোটা তেমন জোরালো নয়, কিন্তু আলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল কমলিকা। ওর আটাশ বছরের মনের মধ্যে একটি পনেরো বছরের কিশোরী জেগে উঠল। খেলাচ্ছলে ও আর একটা মোমবাতি

জবালাল। ঘরটা আগের থেকে উজ্জবলতর হল। আরও একটা মোমবাতি জবালাল কমলিকা, তারপর, এগিয়ে এসে শুভজিতের মুখের কাছে ধরল। দেখল, শুভজিতের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

এতক্ষণ ধরে যে বাজনাটা দু জনে মিলে বাজানোর চেষ্টা করছিল, সেটা ওদের মন দুটোকে পরস্পরের কাছাকাছি টেনে এনেছিল। কমলিকা একবার শুভজিতের মুখের উপর চোখ দুটো পেতে হাসল, তারপর একটার পর একটা মোমবাতি জবালিয়ে শুভজিতের সামনে বৃত্তাকারে সাজাল। সে যেন শুভজিতের জন্যেই এই আলোর অর্ঘ্য রচনা করল। যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসতে লাগল গানের একটা সুর। সেই সুর শুধু ওদের দুজনের কানেই বাজতে লাগল। যে গান কানে শোনা যায় না, সেই গানের সুর। মুগ্ধের মতো ওরা চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে। একটা যুগ যেন কেটে গেল।

কমলিকা স্বপ্নের মধ্যে বলে উঠল, 'আপনাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম বাজাতে, আমাদের প্রেসের প্যাণ্ডেলে, সেদিনও আপনাকে এমনই দেখেছিলাম। হাজার হাজার আলোক বিন্দুর মাঝখানে আপনি সেতার হাতে বতে বসে' ছিলেন।'

শুভজিৎও স্বপ্নোত্থিতের মতো বলল, 'কিন্তু সেদিনের বাজনা আপনাকে মুগ্ধ করতে পারে নি। আমার বাজনার মাঝখানে আপনি আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন।'

কমলিকা অবাক হল, কিন্তু মনের ভিতর খুশির একটা হাওয়া বয়ে গেল। বুঝল, অসময়ে ওর চলে যাওয়া বাজনা বাজাতে বাজাতেও শুভজিৎ লক্ষ্য করেছিল, এবং সেদিনের সেই সন্ধ্যে থেকে শুভজিৎ ওকে মনেও রেখেছিল।

কমলিকা মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ শুভজিতের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখল, শুভজিতের কপালের ঘামের বিন্দু গুলি মোমবাতির আলোয় ছোট ছোট হীরের টুকরোর মতো চিকচিক করছে। শুভজিতের কাছে এগিয়ে গেল ও, তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে আস্তে আস্তে ওর কপাল থেকে ঘামের বিন্দু গুলি মুছে নিল। মুগ্ধের মতো শুভজিতের মুখের পানে চেয়ে রইল কমলিকা; আবার একটা যুগ কেটে গেল।

হঠাৎ যেমন বিদ্যুতের আলো নিভে গিয়েছিল, তেমনি আবার হঠাৎ জবলে উঠল। ঘরের প্রত্যেকটি কোন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হল। সেই অনাবৃত

আলোর রূঢ়তায় ক্ষণকাল আগের স্বপ্নটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দুজনেই মুখ তুলে দেখল, উঠোনের দিক থেকে ভুতু আর মিঠু হুল্লোড় করতে করতে ঘরের দিকে ছুটে আসছে।

কমলিকা ভয় পেল, নিজের উপর বিরক্ত হল সে। হাতের এক ঝটকায় মোমবাতি গুলো নিবিয়ে দিল। মিঠু আর ভুতু ভিতরে এল।

কমলিকা কোনো দিকে চাইল না। আর কোনো কথা বলল না। মিঠুর হাত ধরে টানতে টানতে প্রায় ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। সুরটা সৃষ্টি হতে অনেক সময় লেগেছিল, কেটে গেল এক নিমেষে। শুভজিৎ বাজনা বন্ধ করল, আঙুল থেকে মেরজাফটা খুলে ফেলল, তারপর সেতারটাকে মেঝেতে শুইয়ে রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

দশ

চন্দ্রানীদের বস্তি বাড়ির দরজার সামনে তিমিরের স্কুটার এসে দাঁড়াল। স্কুটারের হর্ন বেজে উঠতে ছোট্ট জানলাটায় চন্দ্রানীর মুখ দেখা গেল। বাইর থেকে হাত নেড়ে ওকে ডাকল তিমির। তিমিরকে দেখে হাসিতে ভরে উঠল চন্দ্রানীর মুখ।

স্কুটারটাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল তিমির। চন্দ্রানী বেরিয়ে আসতেই ওর হাতে এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিল ও। চন্দ্রানী বলল, 'ভেতরে আসুন। এটা কী?'

তিমির বলল, খবরের কাগজের 'কাটিং'। পড়েই দেখো না!' বনওয়ারীলাল বোথরার পরবর্তী ছবি 'একটুকু ছোঁয়া' আগামী কাল শহরের তিনটে নাম করা সিনেমা হাউসে দেখানো হবে। খবরের কাগজের লোকদের জন্যে বিশেষ শো-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। 'দিন বানী' কাগজের কাটিংটাতে একটুকু ছোঁয়া' সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। চন্দ্রানী পড়ে দেখল, মন্তব্যের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে তিমির এবং চন্দ্রানীর গানের কথা লেখা হয়েছে। রিপোর্টার উল্লেখ করেছেন, এই দুই গায়ক গায়িকার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা আছে, এবং দেশবাসী এদের দুজনের কাছ থেকে আরো নতুন, এবং আরো সমৃদ্ধ 'পারফরমেন্স' প্রত্যাশা করতে থাকবে।

চন্দ্রানীর মুখ খুশিতে জবল জবল করে উঠল, একবার মুখ তুলে বাবলুদের জানালাটার দিকে তাকিয়ে দেখল, ওর মুখে একটা লজ্জার আভা ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ পা ছুঁয়ে তিমিরকে একটা প্রণাম করে ফেলল চন্দ্রানী।

প্রণাম পেয়ে তিমির হকচকিয়ে গেল। সে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'আরে, করছ কী? এ ব্যাপারে আমরা হলাম সমান অংশীদার। তাছাড়া, কাগজে কী লিখেছে, দেখছ না? তোমার গান আমার থেকে ভাল হয়েছে।'

চন্দ্রানী মাথা নিচু করে বলল, 'আপনার জন্যেই তো সব হ'ল। ভেতরে আসুন, এককাপ চা খেয়ে যান।' তারপর গলা তুলে ডেকে বলল, 'মা, শিগগির দেখে যাও একবার।

তিমির বলল, 'এখন চা নয়। চলো, বেরুতে হবে।'

চন্দ্রানীর অকালবৃদ্ধা মা দরজার গোড়ায় এসে তিমিরকে দেখে মাথায় কাপড়টা একবার টেনে দেবার চেষ্টা করল। চন্দ্রানী কাগজের কাটিংটা মায়ের হাতে দিয়ে বলল, 'দ্যাখো, কাগজে আমাদের কথা কী লিখেছে।'

আরতি বলল, 'কুলুজি থেকে আমার চশমাটা এনে দে।

চন্দ্রানী ঘরের ভিতর গেল চশমা আনতে।

তিমিরের দিকে ফিরে আরতি বলল, 'তোমাকে আমি কী বলে' আশীর্বাদ করব জানি না। মেয়েটাকে একটু দেখো। ইতিমধ্যে চন্দ্রানী চশমা নিয়ে ফিরে এল। তিমির ওর দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'ওকে আর কারো দেখতে হবে না। ওই এখন অনেককে দেখতে পারবে।' বলে 'চন্দ্রানীর দিকে ফিরে বলল, 'চলো, চন্দ্রানী, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তিমির স্কুটারে উঠে ষ্টার্ট দিল, স্কুটার গোঁ গোঁ করে উঠল, চন্দ্রানী ওর পিছনে গিয়ে বসল, প্রচন্ড আওয়াজ করে' এবং একগাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল স্কুটারটা। দরজায় গোড়ায় দাঁড়ানো আরতির চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

স্কুটার চালাতে চালাতে বলে উঠল তিমির, 'গান ধরো, আজ আমরা ছুটতে ছুটতে গাইব।' তিমির ভাবছিল, আজকের দিনে ওদের থেকে সুখী আর কে আছে, গাড়ির বেগ যে অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে, তা ওর খেয়াল ছিল না।

পৃথিবীর কোনো কিছুকেই আজ আর সে পরোয়া করছিল না।

চন্দ্রানীও ভাবতে চেষ্টা করল, 'আজ আমার থেকে সুখী আর কেউ আছে কি ?' তবুও সুখের মাঝখানে কোথায় যেন একটা কাঁটা ওর মনের ভিতর খচ খচ করে বিঁধতে লাগল। একবার শুভজিতের কথা মনে পড়ল, একবার বাবলুর কথা মনে পড়ল, একবার 'বুড্ডা মিল গায়' গানটার চরণ গুলি মনে পড়ল। কমলিকার কথাও মনে পড়ল চন্দ্রানীর, ওর মুখের রেখা একটু বঙ্কিম হ'ল, কমলিকার ভাবনাটাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল চন্দ্রানী। নিজের মনকে ও জোর করে বলল, 'আমার থেকে সুখী আজ আর কেউ নেই।' যে গানটা সিনেমায় একলা গাইবার কথা চন্দ্রানীর, দু'-একদিনের মধ্যেই যে গানটা ছবি মারফৎ কলকাতার সমস্ত মানুষের কানে গিয়ে পেঁৗছবে, গলা ছেড়ে চিৎকার করে' সেই গানটা গেয়ে উঠল চন্দ্রানী।

বনওয়ারী লালের নতুন ছবি 'একটুকু ছোঁয়া'র বিরাট বিরাট পোষ্টার লাগানো ছিল 'চিত্রিতা' হলের দেয়ালের গায়ে। সিনেমা হলের সামনে স্কুটার থামাল তিমির। চন্দ্রানীকে বলল, 'এসো' একবার ভালো করে দেখি।'

ওরা পোষ্টারের সামনে গিয়ে দেখল, সব নামের সংগে সঙ্গীতাংশে ওদের দুজনের নামও ছাপা হয়েছে। তিমির চন্দ্রানীর হাত ধরল, হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল, 'দেখছ কী ? আগের বইটাতে যখন পোষ্টারে আর কাগজে আমার নাম প্রথম বেরিয়েছিল, মনে হয়েছিল, একটা লাফ দিয়ে আকাশটাকে ছুঁয়ে ফেলি। তোমার তেমনি মনে হচ্ছে না ?'

চন্দ্রানী হেসে ফেলল, ওর বুকের মধ্যে গুরু গুরু আনন্দের ধ্বনি বাজ ছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনি লম্বা মানুষ, আপনার কথা আলাদা। আমার হাত অত দূরে যাবে না।'

চন্দ্রানীর কথায় হো হো করে হেসে উঠল তিমির, তারপর ওর হাত ধরে সিনেমা হলের 'লবি'তে প্রবেশ করল। চন্দ্রানীর দিকে ফিরে বলল, 'দু এক-দিনের মধ্যে বেঙ্গল ক্লাবে আবার পার্টি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এতবড় একটা ঘটনা, আমাদের সেলিব্রেট করতে হবে না ? কলকাতায় সব বাঘা বাঘা লোকদের ডাকতে হবে। মেড়োটার মাথায় আবার হাত বোলাতে হবে।

চন্দ্রানী জিগ্যেস করল, 'মেড়ো কে ? বনওয়ারীদা ?'

তিমির বলল, 'হ্যাঁ। গতবার দু চার জন চেনা জানা লোক এসেছিল মাত্র। এবার একেবারে আনন্দের হাট বসিয়ে দেব।'

চন্দ্রানী জিগ্যেস করল, 'এক একটা পার্টিতে কি রকম খরচ হয় ?'

তিমির তাচ্ছিল্য ভরে বলল, 'কত আর ? বিশ পঞ্চাশ হাজার হবে।'

চন্দ্রানী অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। এমন ভাবে কথা বলছে, যেন ওর কাছে বিশ হাজার আর পঞ্চাশ হাজার একই কথা। ও বলল, 'এতটাকা খরচ করতে বনওয়ারীদা রাজি হবেন ?

তিমির হেসে বলল, ও নিজে কত টাকা পিটবে, জানো ? অন্তত ষাট সত্তর লাখ। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে, পার্টির খরচ তার কাছে নস্যি।

একের পিঠে কটা শূন্য যোগ করলে লাখ হয়, ভাবতে লাগল চন্দ্রানী। 'একটুকু ছোঁয়ার গানের জন্যে ওর সাড়ে তিন হাজার টাকা পাবার কথা। কিন্তু পেয়েছে মোটে দেড়শো। বনওয়ারী বলেছে, 'ঘবড়াচ্ছ কেন, বইটা বাজারে বেরোক আগে। তখন দুচার মাসের মধ্যে বাকি টাকাটা মিটিয়ে দেব।' অবশ্য দেড়শো টাকাও চন্দ্রানীর কাছে কম নয়। ও ভাবল। মা-এর বয়স প্রায় পয়তাল্লিশ, চেহারা দেখে মনে হয় ষাট। এতকাল ধরে কত কষ্ট করে' দাই এর কাজ করে সংসার চালিয়ে এসেছে মা। শুভজিতের সংগে কনসার্টে গেলে সামান্য কিছু চন্দ্রানীরও হাতে আসে। তা ছাড়া ও নিজেও দুটো একটা টিউশানি করে মাঝে মাঝে কিছু রোজগার করেছে। কিন্তু, প্রয়োজনের তুলনায় সে আর কতটুকু ? এ বই বেরোলে বাজারে ওর চাহিদা বেড়ে যাবে। তখন নিশ্চয়ই ভালো রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারবে চন্দ্রানী। অনেক কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল চন্দ্রানীর। ভাবল, এতকাল ধরে বহুকষ্টে সংসারের ঘানি টেনেছে মা, এবার মাকে ছুটি করে দিতে হবে।

চিত্রিতা সিনেমার ম্যানেজার 'লবির এককোণে দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা বলছিল। তিমিরকে দেখে এগিয়ে এল। কোনো এক সংগীত সভায় তিমিরকে ও আগে দেখেছিল। চিনতে পেরে বলল, আপনি তিমির হালদার না ? আজ সকালের 'দিনবানী'তে আপনার কথা পড়লাম। কংগ্রাচুলেশন্‌স্‌ ! কাগজে অন্য এক মহিলার কথাও লিখেছে, খুব ভালো গলা।' বলে লোকটি আড়চোখে একবার চন্দ্রানীর দিকে চেয়ে দেখল।

তিমির গর্বিত ভঙ্গীতে লোকটির দিকে ফিরল, বলল, 'এই সেই মহিলা। চন্দ্রানী গুহ। আপনি কে ?'

লোকটি বিনীত ভঙ্গিতে একবার চন্দ্রানীর দিকে চেয়ে হাত জোর করল

তারপর বলল, 'আমি সামান্য লোক। আপনাদের দয়ায় করে খাচ্ছি। আমি এই হাউসের ম্যানেজার। আমার নাম বিকাশ সিংহ।'

লোকটি চন্দ্রানীকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার অভিনন্দন জানাল। লোকটির নাম বিকাশ সিংহ। সিংহ থেকে সিঙ্গি, সিঙ্গি থেকে শুভজিতের কথা মনে পড়ল চন্দ্রানীর। ও এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হল।

বাইরের ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছোট আয়নাটার দিকে ফিরে চুল আঁচড়াচ্ছিল শুভজিৎ। চুলটা কিছুতেই পছন্দসই হচ্ছিল না। পার্টিতে যেতে হবে, সুতরাং সাজ পোষাক সম্পর্কে ও আজ ভীষণ সচেতন।

এমন সময় বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল। চিরুনি ফেলে শুভজিৎ এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজার বাইরে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে দুটি লোক; শুভজিতের মনে হল, ওদের কোথায় যেন দেখেছে, কিন্তু কিছুতেই মনে আনতে পারছিল না।

এদের মধ্যে একজন বলল, চিনতে পারলেনা তো। থার্ড ইয়ারে ইকনমিকস্-এর প্রফেসর অলক সান্যালকে মনে পড়ছে?'

শুভজিতের মাথার মধ্যে একসঙ্গে কয়েকটা বাতি জ্বলে উঠল, সে বলে উঠল, 'রাজা, তুমি রাজা মুখার্জি! আর ও হচ্ছে দেবু সেন। তোমরা সব সময় একসঙ্গে থাকতে। প্রফেসর সান্যালকে কি জ্বালান্ যে জ্বালিয়েছ, তা বলবার নয়। এসো, ভেতরে এসো।'

ভিতরে যেতে যেতে দেবু বলল, 'আমরা এখনও একসঙ্গেই আছি। আমরা দুজনেই অ্যাটর্নি। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছি। তোমার নাম টাম হয়েছে আমাদের কানে গেছে। তুমি কি শুধু গান বাজনা নিয়েই আছ, না কাজ কর্ম কিছু করছ?'

এক মুহূর্তে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল শুভজিতের। বাড়ির ভিতরে, বাড়ির বাইরে সর্বত্র আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সকলেরই এক প্রশ্ন। সকলের জানা দরকার। ও শুধু গান-বাজনার মতো অকাজ নিয়েই এখনও পড়ে আছে, না, কাজ কর্ম কিছু করছে। ওর মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল, দেবুর দিকে ফিরে বলল, গান বাজনা কি কাজ নয়?'

শুভজিতের উষ্মায় লজ্জা পেল দেবু, বলল, 'না, না, তা নয়, তা নয়। গান বাজনায় বেশ রোজগার টোজগার হয় তো?

শুভজিৎ হেসে বলল, 'রোজগারের জন্যে তো এ লাইনে আসিনি, ভাই। কোনো মতে চলে যাচ্ছে।'

রাজা জিগ্যেস করল, 'বিয়ে-থা করেছ ?'

শুভজিৎ উত্তর করল, 'নাঃ, এখনও নয়।

রাজা বলল, 'প্রেমে টেমে পড়েছ নিশ্চয় ! তোমরা আর্টিষ্ট মানুষ ! তা, বাইরে বান্ধবী থাকলে আর ঘরে বৌয়ের দরকার কী ?'

শুভজিতের মুখের রেখা ঈষৎ বঙ্কিম হল, সে বলল, 'এখনও' পর্যন্ত আমার একটি মাত্র বান্ধবী, এবং তার নাম হচ্ছে সেতার।'

দুই বন্ধু হো হো করে হেসে উঠল। রাজা বলল, 'তাহলে তোমার বান্ধবীর কথাই হোক, আমাদের কোর্টে একটা ফাংশন হবে। তোমাকে ভাই, সেদিন বাজাতে হবে।'

অর্থকরী বুদ্ধি শুভজিতের কোনো দিনই বেশি নয়, কিন্তু তিমিরের সংগে পরিচয় হবার পর এবং বিশেষ করে বনওয়ারীর সংগে সেদিনের কথা-বার্তার পর ওর বৈষয়িক বুদ্ধি জাগতে আরম্ভ করেছে। কী বলবে, ভাবতে ও ভুতুকে ডাকল, এবং তিন কাপ চা আনতে বলল। সর্দারি না করলে ভুতুর পেটের ভাত হজম হয় না, সে গম্ভীর মুখে জানলার বাইরে থেকে বলল 'এখন চা হবে না, মা কাঁথা সেলাই করছে।'

শুভজিতের মনে পড়ল, শিগগিরই বৌদির আবার বাচ্চা হবে। কাঁথা সেলাই নিশ্চয়ই সেইজন্যেই। কিন্তু ভুতুর কেপির দালালিতে বিরক্ত হয়ে বলল, 'যা বলছি তাই কর। মাকে বল্‌গে, তিন কাপ চা বানাতে।' রাজার দিকে ফিরে বলল, 'আজকাল বাজানোর জন্যে নানা জায়গা থেকে ডাক আসছে। তাছাড়া, নানা রকমের সোসাল গ্যাদারিংও আছে।/ আমাকে এখুনি বেরোতে হবে, প্রযোজক বনওয়ারী লালের বাড়িতে পার্টি আছে।

বনওয়ারীর নাম শুনে রাজা এবং দেবুর চোয়াল ঝুলে পড়ল। শুভজিৎ তাইলে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে ইতিমধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে !

বৌদি চা নিয়ে এলেন। ঘরে অচেনা লোক দেখে তিনি নিজের শারীরিক অবস্থার জন্যে একটু লজ্জা পেলেন। মাথায় কোনোমতে আঁচলটা টেনে দিয়ে শুভজিৎকে বললেন, 'ঠাকুরপো, মায়ের জন্যে নন্দীর দোকান থেকে আড়াইশো এরারুট নিয়ে আসতে পারবে ?'

শুভজিৎ বলল, এখন অসম্ভব ! আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।' বলে, জানলার সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'বুদ্ধ, বুদ্ধ, একবার এদিকে শুনে যা।'

দেবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বুদ্ধকে জানলার সামনে দেখা গেল। শুভজিৎ বলল, 'ভেতরে আয়।' পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে, বুদ্ধের হাতে দিয়ে বলল, 'নন্দীর দোকান থেকে আড়াইশো এরারুট নিয়ে আয়। পথে দেরি করবি না। ভুলে যাবি না। যাবি আর আসবি।'

বুদ্ধ বলল, 'আজ সন্ধ্যে সাতটার সময় আকাশে চাঁদের পাশে শুক্রকে দেখা যাবে।'

শুভজিৎ বলল, 'যাক্ গে। তুই শিগগির করে এরারুট নিয়ে আয়।'

বুদ্ধ বলল, 'মঙ্গলটাকে দেখা যাবে রাত নটার পর।'

শুভজিৎ বলল, 'আজ হবে না। কাল রাতে তোর সংগে ছাদে গিয়ে শুক্র আর মঙ্গল দেখব। তুই এখন চট করে গিয়ে এরারুটটা নিয়ে আয়।'

রাজা আর দেবু বুদ্ধের চালচলন দেখে একটু অবাক হয়েছিল। দেবু বলল, 'ছেলেটি কে?'

শুভজিৎ হাত নেড়ে বুদ্ধের প্রসঙ্গটা যেন দূরে সরিয়ে দিল, বলল, 'ও আমাদের পাশের বাড়ির ছেলে। যাই হোক, কবে এবং কোথায় তোমাদের ফাংশন?'

রাজা বলল, আমরা হলাম খুদে অ্যাটর্নি। আইনজ্ঞদের একটা ছোট খাটো সংগঠন আছে, সেখানে কনসার্ট হবে। আগামী শনিবার, সন্ধ্যে ছটায়। আমরা আড়াইশো টাকার বেশি দিতে পারব না তোমাকে ভাই, তাতেই রাজি হতে হবে।'

শুভজিৎ একেবারে বিনা পয়সায় বহু জায়গায় বাজিয়েছে। সে তুলনায় আড়াইশো তো অনেক। শনিবারের মধ্যে বাবলুটা ফিরলে হয়! নইলে তবলা বাজাবে কে? চন্দ্রানীকেও তানপুরা বাজাবার জন্যে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সে এখন বড়ো আর্টিস্ট।

যাইহোক তানপুরার লোক পেতে অসুবিধে হবে না। শুভজিৎ মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি বাজাবো।'

রাজা আর দেবু খুব খুশি। দেবু বলল, 'কোথায় যাবে চলো, তোমাকে আমরা নামিয়ে দিয়ে যাই। আমাদের সংগে মিস্টার বাসুর গাড়ি আছে।'

এমন সময় আকাশের দিকে চাইতে চাইতে এরারুট হাতে নিয়ে বুন্ধ এসে হাজির হল। বুন্ধকে বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে রাজা এবং দেবুর সংগে গিয়ে গাঁড়িতে উঠে বসল শুভজিৎ।

এগারো

নতুন ছবি উপলক্ষে বনওয়ারীলাল বেথারা:' বাড়িতে পার্টি। কলকাতার সমাজের উচ্চতম স্তরের মানুষ যারা তাঁদের অনেকেই এই পার্টিতে উপস্থিত হয়েছেন। তিমিরের কাছে এঁদের নাম, ধাম, পরিচয় শুনে শুভজিতের চোখ কপালে উঠল। আগে কোনোদিনই এদের কাকেও ও চাক্ষুষ দেখে নি। উজ্জ্বলকুমার, মহুয়া মুখার্জি, চিত্রিতা সান্যাল। এসব নামতো মানুষের স্বপ্নের মধ্যে আনাগোনা করে। রক্তমাংসের শরীরে এঁদের দেখে শুভজিৎ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল।

বনওয়ারীর বাড়িটিও দেখবার মতো। আজকালকার দিনে বাড়ির মধ্যে এতবড় হলঘর কল্পনাও করা যায় না। সিলিং থেকে ঝুলছে নানা আকৃতির আধুনিক ঝাড়লণ্ঠন এবং তার ভিতরে ভিতরে অসংখ্য বৈদ্যুতিক বাতি। সাদা পাথরের মেজের উপর মাঝখানটাতে তুলোর মতো নরম কিন্তু মোটা এবং ভারী কার্পেট পাতা। হলঘর এবং তার সংগে সংলগ্ন বাথরুম ছাড়া বাড়িটার আর কোনো অংশ দেখবার সুযোগ হল না শুভজিতের, কিন্তু বাইরে থেকে বাড়িটির বিশাল আকৃতি দেখেই ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই সমাবেশে সেতার বাজাবার ইচ্ছে ওর একেবারেই ছিল না, কিন্তু তিমিরের সনির্বন্ধ অনুরোধে সেতারটাকে সংগে এনেছিল শুভজিৎ। কিন্তু বর্তমান পরিবেশে নিজেকে ওর বড় বেমানান মনে হচ্ছিল। একবার মনে হল না এলেই ভালো হত। আবার মনে হল, না এলে এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকতে হত।

তিমিরের দল তাদের ব্যাণ্ড নিয়ে তৈরি হচ্ছিল। চন্দ্রানীও ওদের দলে। চন্দ্রানীর সাজপোষাক দেখে শুভজিৎ অবাক হল। এ কাকে দেখছে শুভজিৎ? যে মেয়েটিকে ও গত তেরো চোদ্দ বছর ধরে দিনের পর দিন দেখে এসেছে, এ

কি সে-ই ? আজ মনে হল, চিরকালের মতো ওর জীবন থেকে হারিয়ে গেছে চন্দ্রানী। আর বোধহয় চন্দ্রানীকে ও কোনদিনই ফিরে পাবে না।

তিমির ওকে হাত নেড়ে কাছে ডাকল। বলল, 'আপনিও আসুন। আমরা আজ একসংগে বাজাবো। চন্দ্রানী গাইবে।'

শুভজিৎ একটু খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল, বলল, 'আপনাদের ব্যাণ্ডের সংগে সেতার ঠিক জমবে না। আপনারাই বাজান।'

তিমির জোর করে বলল, 'খুব জমবে, আসুন। কখনও কোনো মানুষের কথাতে জোরালো প্রতিবাদ করতে শেখেনি শুভজিৎ। সে এগিয়ে গিয়ে সেতার হাতে তুলে নিল। ভেবে দেখল, এতগুলি নেশাগ্রস্ত মানুষের সামনে আলাদা ভাবে সেতার বাজিয়ে কোনো লাভ নেই, বিশেষ করে তবলায় সঙ্গত করবার মতো কেউ উপস্থিত নেই এখানে। সুতরাং তিমিরের দলের সংগেই বাজানো যাক। একবার মনে হল, এইভাবে যদি বনওয়ারীর নজরে পড়া যায়, তবে ভবিষ্যতের কথা আর ভাবতে হবে না। এতদিন উঁচু আদর্শের কথা খুব বড়ো করে ভেবে এসেছে শুভজিৎ। আজই একঘণ্টা আগে দেবু আর রাজার কাছে ভ্যাঁক করে বলেছিল, টাকার জন্যে ও ফাইন আর্টস-এর লাইনে আসেনি, এসেছে আদর্শের জন্যে। এখন বনওয়ারীর নজরে পড়ার কথা ভাববার জন্যে নিজের উপর মনে মনে একটু বিরক্ত হল শুভজিৎ।

তিমিরের কাছে গিয়ে বলল, কোনো একটা যন্ত্রে একটা সুর কিছুক্ষণ একটানা ধরে রাখুন, আমি সেতারটাকে মিলিয়ে নিই।

বাজনা আরম্ভ করার পর ক্রমশ শুভজিতের বিরক্তি কেটে যেতে লাগল, মনটা একটু একটু করে বাজনার মধ্যে ডুবে গেল। মঞ্চের উপর ব্যাণ্ডের যন্ত্রগুলি ছিল মাঝখানে, ব্যাণ্ডের একধারে সেতার হাতে শুভজিৎ, অন্যধারে মাইকের সামনে চন্দ্রানী। ওদের বাজনার সংগে সংগে ও গলা মিলিয়ে গাইছে।

বাজনাটা ধীরে ধীরে জোরালো হতে লাগল এবং 'ডিস্কো' সংগীতে রূপান্তরিত হল। ঐ জোরালো আওয়াজের মধ্যে সেতারের মৃদু সূক্ষ্মতা কারো খেয়াল হবার কথা নয়। শুভজিৎ অন্যমনস্ক হয়ে চোখ বুজে বাজাচ্ছিল, হঠাৎ দর্শকের দল চেঁচিয়ে উঠতে ওর মনটা বাস্তবে ফিরে এল। ও চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল, মাইক হাতে চন্দ্রানী আস্তে আস্তে দর্শকদের

দিকে এগিয়ে গেল, সামনের কার্পেটমোড়া চার পাঁচ ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করল, ওর গায়ে আগাগোড়া সিল্কের পোষাক, শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, এবং ওর শরীরের অধিকাংশই অনাবৃত।

প্রচুর ড্রিংক এবং ডিস্কোর জোরালো আওয়াজে দর্শকের দল তখন উত্তেজিত, তাদের চোখ চন্দ্রানীর দিকে। কেউ কেউ হাত দিয়ে চন্দ্রানীর দিকে চুম্বন ছুঁড়ে দিচ্ছে, চন্দ্রানী থেমে যেতেই ওরা চেঁচিয়ে উঠছে, আবার! আবার!'

ব্যাণ্ড থেমে গিয়েছিল এমন সময় বনওয়ারী চন্দ্রানীর পাশে এসে দাঁড়াল। জনতার দিকে চেয়ে বলল, ইনি চন্দ্রানী গুহ। এই নতুন তারকাকে আমি আবিষ্কার করেছি। দু'দিনের মধ্যেই 'একটুকু ছোঁয়া' বইতে এই শিল্পীর গলায় এই একই গান আপনারা আবার শুনবেন। আপনারা বিশিষ্ট এবং সম্মানিত অতিথি, আপনাদের সম্মানের জন্যে ছবি রিলিজ হবার আগেই মিস্ চন্দ্রানী গানটি আপনাদের শুনিয়ে দিলেন।' বনওয়ারীর কথা শেষ হবার সংগে সংগে সকলে হাততালি দিয়ে চন্দ্রানীকে সম্বর্ধনা জানাল।

শুভজিতের মনে পড়ল, সেদিন বনওয়ারী বলেছিল, টাকা বানাবার জন্যে সে সিনেমার ব্যবসা করছে বটে, কিন্তু ছবির ভিতর দিয়ে আমাদের দেশের উচ্চ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করাই তার আসল উদ্দেশ্য। আজ ও বুঝল, সব ধাপ্পা। আদর্শ-টাদর্শ সব বাজে কথা, টাকা বানানোই তার একমাত্র উদ্দেশ্য তারজন্যে যদি আদর্শকে বিসর্জন করতেও হয়, তাতেও বনওয়ারীলাল পেছপা নয়।

চোখে একরাশ ঘৃণা নিয়ে চন্দ্রানীর দিকে ফিরে চাইল শুভজিৎ। চার মাসও হয় নি, এর মধ্যে কি বিরাট পরিবর্তন হয়েছে চন্দ্রানীর। ও আজ শরীর দেখিয়ে লোকের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। বেশ্যাবৃত্তির সংগে এর পার্থক্য কোথায়?

শুভজিতের সবচেয়ে বেশি রাগ হল তিমিরের উপর। ঐ বজ্জাতের ধাড়িটা চন্দ্রানীকে টেনে এনেছে এই নর্দমার মধ্যে। ঐ অপদার্থটার জন্যেই চন্দ্রানী একেবারে হারিয়ে গেল ওর জীবন থেকে। চন্দ্রানীতো একান্তভাবে ওরই ছিল, ভাবল শুভজিৎ, কেন যে ও এতদিন লক্ষ্য করে নি? ঐ শয়তানটা ওর কাছ থেকে চন্দ্রানীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে ফেলল।

চন্দ্রানীর মুখে মনোমোহিনী হাসি, সে লুটোনো আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে কাঁধের উপর ফেলল, তারপর শুভজিতের সামনে এসে দাঁড়াল।

শুভজিৎ দু' চোখ দিয়ে ঘৃণা বর্ষণ করতে করতে ওর দিকে ফিরল তারপর অনুচ্চ কঠিন স্বরে বলল, 'তোমার গুরুর সংগীতের আদর্শকে তুমি একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছ। একেবারে বেশ্যাবৃত্তির পর্যায়ে টেনে নামিয়েছ। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ?'

এক নিমেষে চন্দ্রানীর মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল, তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল, 'হল' ঘরে যে এতগুলি মানুষের ভিড়, সে কথা ভুলে গিয়ে, সে একেবারে চিৎকার করে উঠল, 'কী ? কী বললে ? আমি বেশ্যা ? তুমি কী ? তুমি কিসের জন্যে সেতার বাজাও ? তোমার নিজের জন্যে, না, পাঁচজনের জন্যে ? তোমার আদর্শের কোনো অর্থ নেই। তোমার আদর্শ অপরিণত মনের কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। তুমি ধাপ্পাবাজ। তুমি শুধু পরকে ধাপ্পা দিচ্ছ, তা নয়, তুমি নিজেকেও ধাপ্পা দিচ্ছ।'

তিমির এসে চন্দ্রানীর হাত চেপে ধরল, বলল, 'চন্দ্রানী এবার থামো।'

চন্দ্রানী চেঁচিয়ে উঠল, 'না, আপনি আমাকে বলতে দিন। জীবনের সত্যিকারের 'প্যাশন' সম্পর্কে ও কী জানে ? আমাকে বলে, আমি বেশ্যা ! আর নিজের বেলায় বিবাহিত মেয়ের সংগে অবৈধ প্রেম করতে ওর বাধে না। ও ভেবেছে, কমলিকার কথা আমি কিছু জানি না।'

চন্দ্রানীর গলা ভেঙে গিয়েছিল, নিঃশ্বাসের আবেগে ওর বুক দ্রুত ওঠা নামা করছিল , তারপর হঠাৎ ও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

চন্দ্রানীর চিৎকারে এবং কান্নায় উপস্থিত অভ্যাগত দলের মোহভঙ্গ হল, তারা ধীরে ধীরে একে একে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। বেশির ভাগ লোকই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। শুভজিৎ ও তার সেতার হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

অবমন্ন মন নিয়ে দরজার বাইরে এসে দিক ভ্রান্তের মতো এদিকে ওদিকে চাইতে লাগল শুভজিৎ। কোন্ দিক দিয়ে গেলে বড়ো রাস্তায় পড়া যাবে, ও কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিল না। এমন সময় একটা আওয়াজ কানে যেতে ও ফিরে দেখল, তিমির উত্তেজিত ভাবে ওরই দিকে এগিয়ে আসছে। তিমির এসে ওকে সরাসরি আক্রমণ করল, 'আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই,

মেয়েছেলের সম্মান রেখে কথা বলতে জানেন না ?'

শুভজিতের মনের মধ্যে প্রবঞ্চিতের জ্বালা ছিল, সে বিষাক্ত কণ্ঠে উত্তর করল।

'আপনারা কেমন মেয়েছেলের সম্মান রাখেন, তা আমার জানা হয়ে গেছে।'

তিমির একেবারে খেপে গেল, 'আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন, নইলে আমি কিন্তু ধৈর্য হারাবো বলে দিছি।'

শুভজিতের মুখের চেহারা বিদ্রূপে বঙ্কিম হয়ে উঠল, কাটা কাটা ভাষায় তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'আপনার ধৈর্য আপনি হারাবেন, তাতে আমার কিছুই বলবার নেই।'

তিমির এবার সত্যিই ধৈর্য হারাল, এগিয়ে এসে শুভজিতের মুখ লক্ষ্য করে ঘুষি ছুঁড়ে মারল। ঘুষি খুব জোরালো নয়, কিন্তু, তার জন্য শুভজিৎ প্রস্তুত ছিল না, সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। সেতারটা ওর হাত থেকে ছিটকে পড়ল অন্যদিকে। ফটাস্ করে একটা আওয়াজ হল, সেতারের তম্বীটাতে টুং টাং আওয়াজ করে কয়েকটা তার ছিঁড়ে গেল। ঘুষি মারার পর চেতনা ফিরে এল তিমিরের, একটু অনুতাপও হল, সে এগিয়ে এসে শুভজিৎকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। দেখল, শুভজিতের মুখ থেকে রক্তের রেখা গড়িয়ে পড়েছে।

রক্ত দেখে তিমিরের চেতনা পুরোপুরি ফিরে এল। ভাবল, ওর সংগে বিবাদ করবার কোনো মানে হয় না। সে ভাঙা সেতারটা তুলে নিয়ে শুভজিতের হাতে ধরিয়ে দিল, তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি সত্যিই দুঃখিত।'

শুভজিৎ সেতার হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বড়ো রাস্তার দিকে। অপসৃয়মান শুভজিতের মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তিমির, তারপর আবার 'হল' ঘরে ফিরে এল। দেখল, অতিথিদের প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে চলে গেছে। যে দু' চার জন এখনও ঘরের মধ্যে আছেন, তাদের পা-ও বাইরের দিকে। চন্দ্রানী বসে' বসে' নিঃশব্দে কাঁদছে ; চন্দ্রানীর পাশে বসে' আছে বনওয়ারী, সে চন্দ্রানীর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।' মা-পাখি যেমন ছোট ছানাগুলোকে নিজের ডানা দিয়ে আগলে রাখে, বনওয়ারীও যেন

তেমনি সারা শরীর দিয়ে চন্দ্রানীকে আগ্‌লে রেখেছে।

তিমিরকে ফিরে আসতে দেখে বনওয়ারীর মুখ ভ্রু-কুঞ্চিত হ'ল, সে মৃদু কণ্ঠে তিমিরকে তিরস্কার করল, 'তোমার কি আক্কেল বলো দেখি? বয়েস দিন দিন কমছে না কি তোমার? শুভজিতের সংগে মারামারি করতে গেলে কেন?' তিমির কোনো উত্তর দিল না, উত্তর দেবার মতো কোনো কথাও সে খুঁজে পেল না। বহুদর্শী অভিজ্ঞ মানুষ বনওয়ারী, তিমিরের উপর তার প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল, কিন্তু রাগের মাথায় সে নিজের বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট হতে দিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে' বসে রইল।

তিমির একবার হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, রাত বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সে বাইরে গিয়ে স্কুটারটা নিয়ে এল হল ঘরের দরজায়, তারপর চন্দ্রানীকে ডেকে বলল, 'যা হবার হয়েছে, চলো এবার যাই।' চন্দ্রানী তখনও নিঃশব্দে কাঁদছিল, সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আপনি যেতে হয় যান, আমি যাব না।'

তিমির একটু অবাক হল, সে স্কুটার দাঁড় করিয়ে ভিতরে এল আবার, তারপর চন্দ্রানীকে বলল, 'যাবে তো চলো, রাত কম হয় নি।'

চন্দ্রানী আবার বলল, 'আপনি যান, আমি আপনার সংগে যাব না।'

তিমির বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করল, 'আমার অপরাধ?'

চন্দ্রানী বলল, 'আপনারা দুজনেই সমান। আমার অপমানের জন্যে আপনিও কম দায়ী নন।' ঘটনার গতিতে তিমিরের বিরক্তির অবধি ছিল না, এখন চন্দ্রানীর অভিযোগে ওর মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠল। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি মুখ সামলে কথা বলবে, বলে দিচ্ছি।'

বনওয়ারী হাত তুলে বলল, 'তিমির, 'তুমি মাথাটা একটু ঠাণ্ঠা করো। রাগের মাথায় শুভজিৎকে ধরে পিটিয়ে দিলে। মেয়েদের সংগে কিভাবে কথা কইতে হয়, তাও জানো না! চিন্তা করো না, চন্দ্রানী শিগগিরিই ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বরঞ্চ বাইরে গিয়ে দ্যাখো, শুভজিৎ ঠিক আছে কি না। সে হয়তো এখনো ফুটপাথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।'

এ সম্ভবনার কথা তিমিরের মনে হয় নি। স্কুটার নিয়ে সে এবার গেটের বাইরে চলে গেল শুভজিতের খোঁজে। তিমির বেরিয়ে যাবার পর দারোয়ান এসে লোহার কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেট তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে' দিল।

তিমির বেরিয়ে যেতে বনওয়ারী চন্দ্রানীকে নিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেল।

বলল, ওরা শুধু শুধু ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া ঝাটি করে' তোমায় কষ্ট দিল। তোমার একটু বিশ্রাম করা দরকার।

চন্দ্রানী বলল, 'আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

বনওয়ারী বলল,' 'শুতে শুতে রোজই আমার রাত হয়। আমার জন্যে তুমি ভেবো না। আমার বাড়িতে এসে তোমার অপমান হল, এই আমার দুঃখ।'

ভিতরের ঘরে একপাশে বিচিত্র কারুকার্য শোভিত দামী একটা খাট, অন্য পাশে বিরাট একটা সোফা। ঘরের মাঝখানে কাচের টেবিল, টেবিলের উপর ফুলদানির মধ্যে ফুল। চন্দ্রানী এমন ঘর জীবনে কখনও দেখেনি। এমন ঘর যে পৃথিবীতে আছে, তা ও জানত না। মনে মনে নিজেদের বস্তি বাড়ির ঘরের সংগে বনওয়ারীর ঘরের তুলনা করল চন্দ্রানী।

সোফার উপর বসে ছিল চন্দ্রানী, বনওয়ারী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনা দিল, 'আমি তোমার কাছে শপথ করছি, আজ থেকে তোমার সম্মান রক্ষার ভার আমার। জীবনে আর কোনোদিন কারো মুখ থেকে তোমাকে অপমানের কথা শুনতে হবে না।'

আবেগে বনওয়ারীর কণ্ঠরুদ্ধ হল। বনওয়ারীর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে চন্দ্রানীর মনটা একটু হালকা হল। বনওয়ারী উঠে গিয়ে আলমারির ভিতর থেকে একটা স্যাম্পেনের বোতল বার করল।

তিমির বড়ো রাস্তার উপর ধীরে ধীরে স্কুটার চালাতে চালাতে চারদিকে নজর রাখছিল। হঠাৎ দূর থেকে চোখে পড়ল, একটা রাস্তার মোড়ে সেতার হাতে শুভজিৎ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করছে, অথবা বাসের জন্যে। তিমির কাছে এসে বলল, 'এখন আর বাস পাবেন না। ট্যাক্সিওয়ালারাও এতক্ষণে পালিয়েছে। চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিই।'

শুভজিৎ তিমিরের কথার উত্তর না দিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইল। তিমির বলল, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন সব চুকে বুকে গেছে। আসুন—'

শুভজিৎ এবার ফিরে দাঁড়িয়ে কঠিন কণ্ঠে বলল, 'আপনি নিজের কাজে যান, আমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না।'

তিমির রাগ করল না। ওর মনে পড়ল, শুভজিৎ মুখে যাই বলুক না কেন, হাতাহাতি করতে যায় নি। তিমিরই রাগের মাথায় শুভজিৎকে আঘাত করেছে। সেই জন্যে মনে মনে একটু লজ্জাবোধ ছিল।

সে আবার বলল, 'শুভজিৎবাবু, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। চলুন আপনাকে বাড়ি পোঁছে দিই।'

শুভজিতের রাগ পড়ল না, সে বলল, 'আমার টাকা নেই, আমাকে দরদ দেখিয়ে লাভ হবে না। কোনো টাকাওয়ালা অপদার্থের পা চাটুন গিয়ে তাতে আখেরে আপনার লাভ হবে।'

এই বঙ্গোক্তির পর তিমির আর অনুরোধ করল না, অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করে কঠিন কণ্ঠে বলল,' 'মনে রাখবেন, একদিন চাকরির খোঁজে আমার পা চাটবার জন্যে আপনাকে আবার ফিরে আসতে হবে।'

তিমির আর দাঁড়াল না, আবার বনওয়ারী বাড়ির উদ্দেশে স্কুটার ছুটিয়ে দিল।

বনওয়ারীর বাড়ির লোহার গেটের সামনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল তিমির, অনেকক্ষণ ধরে গেটের হাতলগুলো নেড়ে-চেড়ে আওয়াজ করল, কিন্তু বনওয়ারীর কোলাপ্‌সিব্‌ল্ দরজা সে রাতের মতো বন্ধ হয়ে রইল। কেউ দরজা খুলতে এগিয়ে এল না।

বনওয়ারীর বাহুবন্ধনের মধ্যে অসাড় হয়ে পড়ে ছিল চন্দ্রানী। হাজার কথা ওর মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। বনওয়ারী ওর ঘাড়ের মধ্যে মুখ গুঁজে মৃদু চুম্বন করতে করতে বলল, 'তোমাকে আমি বাংলার নাইটিঙ্গেল বানিয়ে দেব, তুমি দেখে নিও।' চন্দ্রানী কোনো উত্তর করল না! ওর মনটা সক্রিয় ছিল, কিন্তু কথা বলবার মতো ভাষা ও খুঁজে পেল না।

বনওয়ারীর বাহুবন্ধনের মধ্যে শুয়ে শুয়ে কত পুরনো কথা যে ওর মনে পড়ল, তা বলবার নয়। ছেলেবেলায় ওর বাবা সারা সন্ধ্যে মদ খেয়ে মাত-লামো করত, সে কথা মনে পড়ে গেল চন্দ্রানীর। চন্দ্রানীর প্রতি বাবার ব্যবহার নিরাসক্ত ছিল, কিন্তু মাকে মাঝেমাঝে মারধোর করত। মনে পড়ল, মায়ের মারের প্রত্যেকটি মার ওর গায়েও লেগেছে। সেই শৈশব থেকে ও পুরুষকে শুধু ভয় করতেই শিখেছে। বাবলুর সংগে ছেলেবেলা থেকে

মিশেছে, কিন্তু সত্যিকারের ঘনিষ্ঠতা যাকে বলে, তা বাবলুর প্রতি কোনোদিন অনুভব করেনি ও। অতি শৈশবে যে কাঁটাটা ওর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল, সেটাই ওকে কোনো পুরুষের সংগে ঘনিষ্ঠ হতে দেয় নি। তারপর শুভজিতের সংগে পরিচয় হল। শুভজিৎ ওকে দয়া দেখিয়েছে, করুণা করেছে। বস্তির এক অবহেলিত মেয়ের প্রতি একটি ভদ্র মানুষের যা করণীয়, তাই করেছে। তার বেশি আর কিছু কি শুভজিতের আচরণের মধ্যে ছিল ?

চন্দ্রানী জানে না। চন্দ্রানী কখনো জানবার চেষ্টা করে নি। পুরুষ সম্পর্কে যে ভয় অতি শৈশবে ওর মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, সেই ভয়ই ওকে কোনোদিন জানবার চেষ্টা করতে দেয় নি। শুভজিতের কথা ভেবে ওর মন মাতাল হয়েছে কতদিন, কিন্তু, ওর সংগে ঘনিষ্ঠতর কোনো সম্পর্কের কথা ও ভাবতে পারে নি। তিমিরের প্রতি চন্দ্রানী কোনো আকর্ষণ অনুভব করে নি কোনোদিন।

তিমিরকে সে উপরে উঠবার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তাকেই কি বেশ্যাবৃত্তি বলে ?

চন্দ্রানী মনে মনে ভাবল। তিমিরও তো ওকে ব্যবহার করতে চেয়েছে নিজের সুবিধের জন্যে। তিমিরের উপর সত্যিই ওর কোনো রাগ নেই। তিমির হয়তো বদরাগী, কিন্তু, মন্দ নয়। ওর চোখের সামনে কোনো উজ্বল ভবিষ্যতের ছবি এর আগে আর কেউ তুলে ধরে নি। শুভজিতের বাজনার দলে ও সাকরেদি করেছে মাত্র, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি সেখানে ছিল না। বাবলুরও তাই। সত্যি কথা বলতে কী, চন্দ্রানী ভাবল, শভজিৎ তো ওদের দুজনকে শুধু নিজের প্রয়োজনে ব্যবহারই করেছে। তার বেশি আর কিছু কি ওরা শুভজিতের কাছ থেকে পেয়েছে ? তিমিরই প্রথম একটা নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের দরজা ওর সামনে খুলে ধরেছিল ; তিমিরের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতাবোধ করল চন্দ্রানী।

বনওয়ারীর আলিঙ্গন আরও নিবিড় হল, আরও নির্মল হল। চন্দ্রানীর মনটা হাজার চিন্তার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, কী আশ্চর্য, শরীরটা বনওয়ারীর আলিঙ্গনে সক্রিয় হয়ে উঠল। নিজের উপর বিরক্ত হল চন্দ্রানী। একেই কি বেশ্যাবৃত্তি বলে ? মিনিট দশেক বাদে বনওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে

বলল, 'তুমি এই বিছানাতেই ঘুমিয়ে নাও কয়েক ঘণ্টা। আমি সকালে এসে তোমাকে তুলে দেব। কাল আমাদের অনেক কাজ। পাশের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল বনওয়ারী।

সে রাতে ঘুম হল না চন্দ্রানীর। ওর প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা কারো নেই। ওর বাবারও ছিল না, শুভজিৎ এবং তিমিরেরও নয়, বনওয়ারীরও নয়। বারবার মনে হতে লাগল, 'কিছু পাই নি, কিছু পাই নি, কিছু পাই নি। ওর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়তে লাগল।

বারো

সকালে রাণাকে সেতারের লেস্‌ন্ দিচ্ছিল শুভজিৎ। এমন সময় তিমির এল। হাতে একটা খবরের কাগজের বাণ্ডিল। শুভজিৎ বিরক্ত চোখ তুলে জিগ্যেস করল, 'আবার কী চাই ?'

শুভজিৎ লক্ষ্য করল, তিমিরের সাজ পোষাক বিপর্যস্ত এখানে ওখানে ভিজে কাদা মাটির দাগ। চুল এলোমেলো। মুখের মধ্যে গভীর হতাশার ছাপ।

তিমির শুভজিতের প্রশ্নের উত্তর দিল না, একটা চেয়ার টেনে বসল। চেয়ে দেখল, শুভজিতের চোখের নিচে কালসিটের দাগ।

দুজনে দুজনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, শুভজিতের মুখে বিরক্তি, এবং তিমিরের মুখে হতাশার চিহ্ন। শুভজিৎ রাণার দিকে চেয়ে বলল, 'তুই আজ বাড়ি যা, কাল আবার আসিস্।'

তিমিরকে দেখে বিরক্ত হয়েছিল শুভজিৎ, কিন্তু ওর মুখের চেহারা দেখে বুঝেছিল, কিছু একটা হয়েছে।

রাণা বেরিয়ে গেলে শুভজিৎ আবার প্রশ্ন করল, 'কী দরকার বলুন।'

তিমির জিগ্যেস করল, 'আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন ?'

শুভজিৎ বলল, 'ঐ তো টেবিলের ওপর কাগজটা পড়ে আছে, এখনও পড়বার সময় পাই নি। কেন, কাগজে কী আছে ?'.

তিমির নিজের হাতের 'দিনবাণী' কাগজখানা শুভজিতের দিকে এগিয়ে দিল। 'দিনবাণী' লিখেছে, উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী চন্দ্রানী গুহ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। চন্দ্রানীদের বাড়ির পিছনে একটা নিমগাছ আছে, সেই গাছের ডালে শাড়ির আঁচল বেঁধে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শুভজিৎ চোখ তুলে জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে চেয়ে দেখল। মনে পড়ল, ঐ নিমগাছটা ওর কত কালের চেনা। সকালে যখনই চন্দ্রানীদের পাড়ায় যাবার দরকার হয়েছে, ও সবসময় ঐ নিমগাছটা থেকে একটা ছোট্ট ডাল ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতন করেছে। শুভজিৎ ভাবল, ঐ নিমগাছটাই বোধহয় চন্দ্রানীর প্রাণস্পন্দনের শেষ সাক্ষী।

বাড়ির পিছনের গলির ওপাশে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, সেটা সে ঘুম থেকে উঠেই টের পেয়েছিল। কিন্তু সে যে চন্দ্রানীর মৃত্যু, তা তখন বোঝে নি। বাবলুও এখানে নেই, নইলে হয়তো মাঝ রাতেই ওর কাছে খবর পৌঁছে যেত।

শুভজিৎ ভাবতে লাগল, কেন এমন হল? গত তেরো চোদ্দ বছর ধরে চন্দ্রানী ওর পাশে পাশে থেকেছে, যখনই যেখানে বাজাবার জন্যে ডাক পড়েছে তখনই এক পায়ে খাড়া থেকেছে। কখনও প্রতিবাদ করেনি। কখনও কখনও অসুস্থ শরীরেও ওর বাজনার সংগে তানপুরা বাজিয়েছে। প্রতিদানে কী পেয়েছে চন্দ্রানী? চন্দ্রানীদের এত অভাব, শুভজিৎ ওকে কটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পেরেছে?

চন্দ্রানীর মন যে ওর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, তা কি কখনও জানতে পারেনি শুভজিৎ? নিশ্চয়ই পেরেছে। কিন্তু ভিতু শুভজিৎ না-জানার ভান করে এড়িয়ে গেছে। বস্তির মেয়ে চন্দ্রানীর ভালবাসাকে স্বীকার করতে রাজি হয় নি ওর রক্ষণশীল মন। তিমির যখন চন্দ্রানীর সামনে দ্রুত উন্নতির সুযোগ এনে দিয়েছে, তখন খুশি না হয়ে ঈর্ষ্যাবোধ করেছে সে। মনে মনে যতই সে ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করল, ততই নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে থাকল শুভজিৎ।

অসীম আত্মগ্লানিতে বারবার নিজেকে বলতে লাগল, সব দোষ আমার, সব সব দোষ আমার, আমার দোষেই ও চলে গেল।

তিমির বলল, 'কাল সকালেও চন্দ্রানীর সংগে আমার দেখা হয়েছে। বনওয়ারীর সংগে স্টুডিয়োতে এসে ছিল। আমার সংগে একটাও কথা বলে নি,

আমি আপনার ওপর যে ব্যবহার করেছি, তার জন্যে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলাম, সে কোনো উত্তর দেয় নি। সমস্ত সময়টা সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে।'

শুভজিতের গলার হাড়টা নড়ে উঠল, কী যেন একটা বলতে গেল ও, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। একবার ওর সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল, তারপর দৃষ্টিহীন চোখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে আবার চেয়ে রইল সে।

তিমির মাথা নিচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'স্টুডিওতে পোঁছেই ও দরোয়ানকে বলল, একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে। বনওয়ারী তখন নিজের গাড়িতে করে ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। আমরা চলে যাবার পর বনওয়ারীর বাড়িতে পরশু রাতে কী ঘটেছিল জানিনা, কিন্তু কাল সকালে কারো সংগে ও একটাও কথা বলে নি। যতটুকু সময় স্টুডিয়োতে ছিল, দাঁতে দাঁত চেপে একটা টুলের ওপর চুপ করে বসেছিল।'

শুভজিৎ আগেও কথা বলে নি, এখনও কিছু বলল না, একদৃষ্টে চেয়ে রইল জানলাটার দিকে। তিমিরের চোখ শুকনো, গলার স্বরও স্বাভাবিক, কিন্তু এই ঘটনাতে মনটা যে কি পরিমাণ বিপর্যস্ত হয়েছে, শুভজিৎ তা বুঝল। তিমিরের মনের কান্না শুভজিতের হৃদয়তন্দ্রীতে আঘাত করতে লাগল।

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে রইল তিমির, ওর মুখ থেকে বিরাট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। শুভজিতের দিকে চেয়ে করুণ কণ্ঠে বলল, 'সেদিন আপনার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছি আমি। যদি পারেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনিই যে চন্দ্রানীর কাছে সব, তা তখন বুঝি নি। আপনার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছে। এখন আমরা দুজনেই ওকে হারালাম।'

আরও একটুকাল মাটির দিকে চেয়ে রইল তিমির, তারপর ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হঠাৎ চন্দ্রানীর মায়ের কথা মনে পড়ল শুভজিতের। কাল মাঝরাতে আত্মহত্যা করেছে চন্দ্রানী, সেই সময় থেকে এই আট দশ ঘণ্টা কেমন কেটেছে আরতিদির কে জানে? যৌবনে স্বামীর অত্যাচারে কত কষ্ট পেয়েছেন, তা

কিছুটা চন্দ্রানীর কাছ থেকে, কিছুটা আন্দাজে, জানতে পেরেছিল শুভজিৎ। চন্দ্রানীকে বুকে করে তিনি নিজের বঞ্চিত জীবনের দুঃখ ভুলে ছিলেন। এই পৃথিবীর সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা সবই তাঁর কাছে আজ অর্থহীন হয়ে গেল। আরতিদির সংগে দেখা হলে কী যে বলবে, তা ভেবে পেল না শুভজিৎ।

বাবলু ফিরলে তাকেই বা মুখ দেখাবে কিভাবে ?

জানলার বাইরে বুদ্ধের মুখ দেখতে পেয়ে চিন্তার মাঝখানে ছেদ পড়ল শুভজিতের। বুদ্ধের দিকে চেয়ে বলল, 'চল্ আমরা একটু ঘুরে আসি।'

বুদ্ধ সারাটা দিন এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়ায়, সকলেই ওকে চেনে, কেউ কিছু বলে না। সে ছুটে এসে শুভজিতের হাত ধরে বলল, 'চলো।'

বুদ্ধদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে একবার মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখল শুভজিৎ। ভিতরের বারান্দায় বসে মানিক বিশ্বাস খবরের কাগজ পড়ছিল। শুভজিৎ রাস্তা থেকে ডেকে বলল, 'মানিকদা, আমি বুদ্ধকে নিয়ে একটু ঘুরে আসছি।'

মানিক মুখ তুলে শুভজিৎকে দেখে বলল, 'কী বললে ? ও, হ্যাঁ, যাও। এদিকে কী হয়েছে, শুনেছ বোধহয় ?'

'হ্যাঁ, উত্তর করল শুভজিৎ।

মানিক অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'যদিও বস্তির মেয়ে, কিন্তু তোমাদের সংগে ওঠা বসা করে বেশ মানুষের মতো হয়ে উঠেছিল, কী যে হল, কে জানে ? তুমি তো ওদের খবর টবর রাখতে, কী হয়েছিল, কিছু জানো ?'

নিজেও যে বিশেষ কিছু জানে তা নয়, তাছাড়া মানিকের কৌতূহল মেটাবার সাধ শুভজিতের ছিল না। সে শুধু 'কিছু জানি না' বলে বুদ্ধের হাত ধরে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ বুদ্ধ বলে উঠল, 'চন্দ্রানী মরে গেছে।'

শুভজিৎ জিগ্যেস করল, 'তুই জানলি কি করে ?'

'মা বলেছে, বুদ্ধ বলল।'

শুভজিৎ জিগ্যেস করল, 'মা জানল কি করে ?'

বুদ্ধ বলল, 'বাবা বলেছে।'

'বাবা কি করে জানল, তুই জানিস ?' শুভজিৎ আবার প্রশ্ন করল।

'জানিনা। ও কোথায় গেছে?' বুদ্ধ জিগ্যেস করল।

'কে?'

'চন্দ্রানী?'

'মরে গেছে,' বলল শুভজিৎ।

'মরে কোথায় গেছে?' বুদ্ধ কৌতূহল প্রকাশ করল। বেচারা বুদ্ধ!

'জানি না রে। জানলে তো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারতাম।' শুভজিতের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। 'পরশুদিন রাতেই আমি ওকে ফিরিয়ে আনতে পারতাম,' শুভজিৎ মনে মনে ভাবল, 'শুধু অন্ধ অভিমানের বশে ফিরিয়ে না এনে দূরে সরিয়ে দিলাম। এতদূরে সরিয়ে দিয়েছি, যে আর ফিরিয়ে আনবার পথ বন্ধ হয়ে গেল।'

ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা পানের দোকানের কাছে এসে পড়ল। পানের দোকানে রেডিয়ো বাজছিল। হঠাৎ চন্দ্রানীর নাম কানে যেতে শুভজিতের গতি রুদ্ধ হল। বুদ্ধের হাত সজোরে চেপে 'ধরে' উৎকর্ণ হয়ে' দোকানটার দিকে তাকিয়ে রইল শুভজিৎ। খবরে চন্দ্রানীর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হচ্ছে। নতুন কোনো খবর নেই। যা খবরের কাগজে লেখা ছিল, তাই। সংবাদের পর চন্দ্রানীর গান বাজানো হল। বুদ্ধও চন্দ্রানীর গলা চিনতে পেরেছিল। সে উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে গেল, শুভজিৎ ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ওকে চুপ করতে বলল। যতক্ষণ গানটা বাজানো হল, ততক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুভজিৎ। এত ভাল গাইত চন্দ্রানী? কেন এতদিন লক্ষ্য করেনি শুভজিৎ? তিমির চন্দ্রানীর প্রতি যে কর্তব্য করতে গিয়েছিল, ওরই তো তা করা উচিত ছিল অনেককাল আগে। তাহলে এতদিনে চন্দ্রানী একজন নামকরা শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। 'আমি শুধু নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছি, 'নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে শুভজিৎ ভাবল, 'যে দু'টি মানুষ আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে' জীবন কাটাচ্ছিল, তাদের জীবনের কথা আমি কখনোই ভাবি নি।' তিমিরের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করল শুভজিৎ। তিমিরের কাছে নিজেকে আজ ছোট মনে হল শুভজিতের।

চন্দ্রানীকে ঘিরে হাজার চিন্তা ওর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মনে পড়ল, কতবার দোলের দিন ওর মুখে আবীর মাখিয়ে, ওর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে চন্দ্রানী! কতদিন ওর খাওয়ার সময় উপস্থিত থেকে

যত্ন করে ওর খাওয়ার তদারক করেছে ! কতবার শুভজিতের অসুখের সময় রাতের পর রাত জেগে ওর সেবা করেছে ! প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, তুচ্ছ-অতুচ্ছ, সব কথাই বারবার মনে পড়তে লাগল শুভজিতের। চন্দ্রানী তো চলে যাবেই, কিসের আশায়, কিসের ভরসায় ও থাকবে ? ও ভালবাসা চেয়েছিল, পায় নি ; নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব একটা জীবন আকাঙ্ক্ষা করেছিল, তা-ও পায় নি। বঞ্চনা ছাড়া জীবনে যে কিছু পায় নি, সে থাকবে কেন ? চন্দ্রানীর জীবনের বঞ্চনাতে ওর নিজের অবদান কতখানি, তাই ভাবতে লাগল শুভজিৎ। চন্দ্রানী শুধু চলে গেছে তা নয়, কোনো দিক দিয়ে কোনো দাবি না করে' শুভজিৎকে একেবারে নিঃসর্ত ভাবে ক্ষমা করে' চলে গেছে ওর জীবন থেকে। চন্দ্রানী ক্ষমা করে গেছে বলেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না শুভজিৎ। কে ভেবেছিল, সেদিনকার 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে চন্দ্রানীর 'উত্তীয়ের ভূমিকা এমন নির্মম ভাবে সত্য হয়ে উঠবে !

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দুজনে গঙ্গার ধারে এসে পেঁৗছল। একটা জেটিতে উঠে পা ঝুলিয়ে বসল নদীর দিকে মুখ করে।

শুভজিৎ জিগ্যেস করল, 'হ্যাঁ রে, তুই সেতার শিখবি ?'

'নাঃ,' বুদ্ধের দ্বিধাহীন উত্তর।'

'তুই কিছু শিখতে চাস্ না ?'

'হুঁ।'

'কী ?'

'আমি গান শিখব। তুমি শেখাবে ?'

শুভজিৎ বলল, 'আমি তো গাইতে জানিনা !'

বুদ্ধ বলল, 'আমি সেতার শিখব না।'

শুভজিৎ বলল, 'শিখতে হবে না, তুই একটা গান গা দেখি।'

বুদ্ধ জিগ্যেস করল, 'কোন্ গান ?'

শুভজিৎ বলল, 'জীবন যখন শুকায়ে যায়—'

বুদ্ধ মাথা নেড়ে বলল, 'আমি ও গান জানি না।'

শুভজিৎ বলল, 'যা জানিস তাই গা।'

বুদ্ধ হঠাৎ গেয়ে উঠল, 'ও ম্যয় কা করুঁ রাম, মুঝে বুঢা মিল গয়া।'

বুদ্ধের গলার আওয়াজ মিষ্টি, সুরও প্রায় নির্ভুল।

শুভজিৎ বলল, 'আমি তোকে গান শেখানোর ব্যবস্থা করব। এ গান তুই কোথায় শিখলি ?'

'চন্দ্রানীর কাছে,' বুদ্ধের উত্তর।

শুভজিতের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তাই গানটাকে এত চেনা চেনা মনে হচ্ছে! বলল, 'কবে শিখেছিস্ ?'

বুদ্ধ জলের দিকে একটা ঢিল ছুঁড়ল, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও তো সব সময় এ গান গাইত।'

ঢিলের চারপাশে জলটা বৃত্তাকারে দূরে সরে যেতে লাগল। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুভজিতের চোখের সামনে থেকে অনেকদিন আগেকার একটা কালো পর্দা সরে গেল। মনে পড়ল তেরো বছর আগে যেদিন প্রথম বাবলু আর চন্দ্রানীকে ও দেখেছিল সেদিনও ওরা এই গানটাই গাইছিল। এই গানের কথা নিয়ে বাবলু আর চন্দ্রানীকে কতদিন হাসাহাসি করতে শুনেছে শুভজিৎ, তখন তার অর্থবোধ হয় নি। আজ যেন কথাগুলির অর্থ ওর কাছে স্পষ্ট হল।

বুদ্ধ জিগ্যেস করল, 'বুঢা কাকে বলে ?'

শুভজিৎ ওর কথা শুনে হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল। বুদ্ধ শুভজিৎকে কখনো এমন পাগলের মতো হাসতে দেখে নি। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। হাসির তাড়নায় শুভজিতের চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল শুভজিৎ, বলল, 'চল্, এবার বাড়ি যাই। বুডঢা মানে জানিস্ না ? বুডঢা মানে, বুড়ো। অনেক বুড়ো হয়ে গেলাম রে বুদ্ধ, অনেক বুড়ো হয়ে গেলাম !'

তেরো

বীণাবাদিণী প্রকাশন ভবনের আধুনিকীকরণের কাজ প্রায় শেষ। বাইরে থেকে বিশেষ বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে একেবারে খোল নলচে পালটে ফেলা হয়েছে। সমস্ত বাড়িটার ভিতরে-বাইরে সর্বত্র প্রয়োজন মত জায়গায় জায়গায় প্লাস্টার লাগানো হয়েছে। আগাগোড়া চুনকাম করা হয়েছে।

ঘরগুলোর মাঝে মাঝে কিউবিক্ল্ বসিয়ে প্রত্যেকটি কর্মীকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সেদিন বেলা দশটায় এসে নিজের কিউবিক্ল-এ ঢুকে বেল টিপে অনুকূলকে চা দিতে বলল কমলিকা।

এমন সময় প্রকাশ বাবু ওর ডেস্কের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। প্রকাশ সামন্ত ওদের অনেক দিনের খদ্দের। সামন্ত প্রকাশনীর মালিক।

সামন্ত প্রকাশনীর অনেক ছাপানোর কাজ বীণাবাদিণীতে করা হয়। কমলিকা জানত, ব্যবসার খাতিরে প্রকাশ বাবুকে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'আসুন বসুন, কী খবর বলুন। দাঁড়ান, 'এক কাপ চা আনতে বলি।'

প্রকাশ বাবু নিতান্তই অমায়িক লোক, কিন্তু আজ তাঁর মেজাজটা তেমন অনুকূল বলে' মনে হল না। উনি বললেন, 'আপনাদের সংগে অনেকদিনের কারবার, আগে কখনো নালিশ জানাতে হয় নি। অক্ষয়বাবু আমার পিতৃবন্ধু কিন্তু, আর না বললেই নয়। গত তিন সপ্তাহে তিনটে লট্ আপনাদের ডেলিভারি দেবার কথা ছিল ; তার প্রথম লটটা সবেমাত্র কাল পেয়েছি। আর দুটো এখনও পাই নি। কবে পাব, বুঝতে পারছি না। কী হচ্ছে আজকাল আপনাদের ? আগে তো কখনও এমন হয় নি !

প্রকাশ বাবু মানী খদ্দের। তাঁর সংগে বীনাবাদিনীর অনেক টাকার লেন দেন। তাঁকে খুশি রাখা দরকার, নইলে সমূহ ক্ষতি। কমলিকা কী বলবে, ভেবে পেল না। ইতিমধ্যে অনুকূল কমলিকার জন্যে চা নিয়ে এল।

চায়ের কাপ প্রকাশবাবুর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ও বলল, 'আপনি চা খান, আমি ততক্ষণ দেখছি, কী ব্যাপার।' বলে, সে তার কিউবিক্ল্ থেকে বেরিয়ে গেল। পীযূষের ঘরে গিয়ে তাকে প্রকাশবাবুর নালিশের কথা জানাল। পীযূষ বলল, 'আপনি এখন ম্যানেজমেণ্টে আছেন ; এ রকম ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটবে ; আপনাকে সামলাতে হবে। নিজে থেকে আপনাকে সময়ে অসময়ে ডিসিশন নিতে হবে।'

কমলিকা অবাক হল, বলল, 'উনি দু সপ্তাহ ধরে' পাওনা জিনিস পান নি। এদিকে খরচ বাবদ প্রায় এইটটি পার্সেণ্ট টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে বসে' আছেন। সুতরাং, ওঁর পক্ষে কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করানো এখন আর সম্ভব নয়। আমাদের যে ভাবেই হোক, দু' একদিনের মধ্যে ওঁর মাল রেডি করে দিতে হবে।'

পীযূষ হাসল, তার হাসির মধ্যে কোথায় যেন বিদ্রূপের ছোঁয়া ছিল। সে বলল, 'প্রকাশ বাবুর থেকে অনেক বড়ো খদ্দের আমাদের আছে। তাদের আগে খুশি রাখা দরকার। প্রকাশ বাবুকে আরও দু' চারদিন অপেক্ষা করতেই হবে। জানেনই তো, বড়ো মেশিনটা চারদিন ধরে অচল হয়ে পড়ে আছে। মিস্তিরি ডাকা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের আসবার সময় হয় নি। হঠাৎ আবার লোডশেডিং বেড়ে গেছে গত দু দিন থেকে। এ গুলোও তো দেখতে হবে!'

প্রকাশবাবুর সম্পর্কে পীযূষের নিরাসক্ত মন্তব্যে অবাক হল কমলিকা। পীযূষের ব্যাপারে স্বপনের কথাগুলো অনেকদিন বাদে মনে পড়ে গেল আবার। প্রকাশ বাবুকে কী বলবে, তাই ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরের দিকে ফিরল কমলিকা।

সবদিন সমান যায় না। কোনো দিন একরকম নির্বিঘ্নে কেটে যায়, কোনো কোনো দিন ঝামেলার চূড়ান্ত হয়। প্রকাশবাবুর নালিশ দিয়ে দিনের শুরু হয়েছিল, প্রকাশবাবু একরকম অসন্তুষ্ট হয়েই ফিরে গেছেন। এবং তা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ করেন নি। তারপর প্রিন্টার রফিক আলির সংগে একজন লরি চালকের প্রায় হাতাহাতি হয়ে গেল। সে সব সামলাতে হল কমলিকার। সারাটা দিন নানান ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে বেলা পাঁচটায় ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে রাস্তায় এসে নামল কমলিকা। আজ আবার শুভজিতের বাড়িতে যাবার কথা মিঠুর সেতারের লেস্‌ন্‌-এর জন্যে। মিতালির বাড়ি থেকে মিঠুকে তুলে নিতে হবে। সামনে যে বাসটা এসে দাঁড়াল, তার চেহারা দেখে কমলিকার মুখ বিকৃত হল। প্রচণ্ড ভিড়। কিন্তু কোনো উপায় নেই। যেন তেন প্রকারেণ, এই বাসেই উঠতে হবে। নইলে অনেক দেরী হয়ে যাবে শুভজিতের বাড়িতে পৌঁছতে।

মিতালির কোনো ছেলেপুলে নেই। তাই মিতালির বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে মিঠুর কোনো উৎসাহ নেই। কিন্তু, কমলিকার আর কোনো উপায়ও নেই। মিতালির বাড়ির কাছে পৌঁছে কমলিকা দেখল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদগ্রীব হয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে মিঠু। ওর সাড়া পেয়ে মিতালি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বলল, 'রোজ এসেই মিঠুকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে' যাস্‌ তুই। আয়, আজ একটু চা খেয়ে যা।'

কথাটা সত্যি। একদিনও মিতালির সংগে বসে' দুটো মিনিট কথা বল-

বার সময় পায় না ও। আজ না হয় শুভজিতের বাড়িতে পৌঁছতে দশ-মিনিট দেরীই হবে। কমলিকা বলল,' 'ঠিক আছে, একটু চা বানা দেখি। গলাটাও শুকিয়ে গেছে। ট্রাম বাসে ওঠা নামা করতে গায়ের আদ্দেক রক্ত শুকিয়ে যায়। দশ মিনিটের বেশি বসতে পারব না কিন্তু।'

মিঠুর হাত ধরে কমলিকা যখন শুভজিতের দরজায় গিয়ে পৌঁছল, তখন পৌনে ছ'টা বাজে। সাড়ে পাঁচটায় ওর আসবার কথা। মাত্র পনেরো মিনিট দেরী হয়েছে। তা হোক গে। আজকাল রাস্তা ঘাটের যা অবস্থা, পনেরো মিনিট দেরী তো হতেই পারে, একশো পনেরো মিনিট যে দেরী হয় নি, সেই যথেষ্ট।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কমলিকা কড়া নাড়ল।

দু বার কড়া নেড়েও কোনো সাড়া না পেয়ে ও দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। দেখল, বাইরের ঘরটা খালি, বাড়ির ভিতর থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে ভুতু। এবং ভুতুর পিছনে পিছনে আসছেন তার মা।

কমলিকা একটু অবাক হল। ভুতু বলল, 'কাকু বাড়ি নেই। বেনারস গেছে।' কমলিকা ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়াল। ভিতরটা কেমন যেন অন্য রকম মনে হল। লক্ষ্য করল, মেজের উপর সেতারটা নেই।

মুখ তুলে দেখল, শুভজিতের বৌদি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, 'কাল দুপুরের ট্রেনে ঠাকুরপো বেনারস গেছে। মাস খানেক বাদে ফিরবে।'

কমলিকা একটু অবাক হল। গত সপ্তাহে যখন ও এসেছিল, তখন তো ও বেনারস যাবার কথা শোনে নি! হঠাৎ কী হল? শুভজিতের গুরুদেবের কিছু হল না কি?

বৌদি জানালেন, গত সপ্তাহে যাবার কোনো ঠিক ছিল না, এবং গুরুদেবও বহাল তবিয়তে আছেন। তারপর ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি চন্দ্রানীর ব্যাপারে কিছু শোনেন নি?'

কমলিকা অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'চন্দ্রানীর কি ব্যাপার?'

বৌদি বললেন, 'চন্দ্রানী আত্মহত্যা করেছে। কেন, কাগজেতো বেরিয়েছে।'

কমলিকার কাগজ পড়বার অভ্যেস কোনো কালেই নেই, তাছাড়া সময়ও নেই। কিন্তু খবরটা আবছা-আবছা ওর কানে এসেছিল। ও শুনেছিল,

এক উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু, সে যে চন্দ্রানী, তা সে জানতে পারে নি।

কমলিকা একটুকাল মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। যখন মুখ তুলল, দেখল, শুভজিতের মা এসে দাঁড়িয়েছেন। কমলিকা বৌদিকে জিগ্যেস করল, 'কি হয়েছিল চন্দ্রানীর ?'

বৌদি হাত নেড়ে বললেন, 'কি জানি ? মেয়েটা আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করত। ঠাকুরপোর সংগে গান বাজনা করত। কি যে হল, কে জানে ?

কমলিকার সহসা মনে হল, চন্দ্রানীর মৃত্যুর সংগে হয়তো শুভজিতের বেনারস যাওয়ার সম্পর্ক আছে।

কমলিকার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে বাজতে আরম্ভ করল। ও ভাবতে লাগল, শুভজিত হঠাৎ বেনারস গেল কেন ? ওকেই বা জানালো না কেন ? বৌদিই বা হঠাৎ চন্দ্রানীর প্রসঙ্গ তুললেন কেন ?

মা বললেন, 'তুমি বোসো না, বাছা। বৌমা এককাপ চা বানিয়ে দিক, খেয়ে যাও।'

কমলিকার হঠাৎ নিজেকে বড়ো দুর্বল বোধ হতে লাগল, সে ধীরে ধীরে একটা চেয়ারের উপর ধপ্ করে' বসে পড়ল। মা বললেন, 'আজকাল যা যুগ পড়েছে, সময়ে কোনো ছেলে মেয়ের বিয়ে হয় না। তাই নানা রকমের কেলেঙ্কারি লেগেই আছে।'

কমলিকা জিগ্যেস করল, 'চন্দ্রানীর সম্পর্কে আপনি কিছু শুনেছেন নাকি ?'

মায়ের কথা শুনে কমলিকা বুঝল, তিনি চন্দ্রানীর ব্যাপারে কিছুই জানেন না ; কিন্তু বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন ঘটনাটি যৌন ঘটিত ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়, এবং সময়ে ছেলেমেয়েদের বিয়ে না হওয়ার এই ফল।

বৌদি এক কাপ চা এনে কমলিকার হাতে দিলেন। মিঠু ভুতুর সংগে উঠোনে খেলছিল, কমলিকা লক্ষ্য করল, বৌদি মিঠুর হাতে দুটো বিস্কুট দিলেন। বৌদিকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল কমলিকা।

মা বললেন, 'সুবুটাও হয়েছে তেমনি। সারাদিন শুধু সেতার আর সেতার। আর কত দিন যে এ ভাবে কাটাবে, কে জানে ? বড় ছেলে তো

সারাদিন বাড়িই থাকে না। সেই ভোর বেলায় উঠেই নাকে মুখে দুটো গুঁজে বেরিয়ে পড়ে, ফেরে সূয্যি ডোবার পর। আমরা দুটি মেয়ে ছেলে। বৌমার আবার এখন-তখন। কি ভাবে যে ছেলেটার বিয়ে দেব, কে জানে? তোমার চেনা শোনা মেয়ে কেউ যদি থাকে তো বলো, আমি সম্বন্ধ করি।'

মায়ের কথাবার্তার ধরণ কমলিকার মোটেই পছন্দ হল না, এবং তার সন্দেহ পরায়ণতার জন্যে তাকে সংকীর্ণ চিত্ত বলে মনে হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেল, আমি আজ আসি। মেয়ের সন্ধান পেলে আপনাদের জানাবো। নইলে মাস খানেক বাদে আমি আবার খবর নিয়ে যাব।' বলে' উপস্থিত মহিলা দুজনকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে মিঠুর হাত ধরে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। দিনটা যেদিন খারাপ যাবার, সেদিন ভোর থেকেই শুরু হয়ে যায়। ইংরিজিতে প্রবাদ আছে: সকালই দিনের সূচনা করে। অফিসে সারাদিন যুদ্ধ করে শুভজিতের বাড়িতে গিয়ে আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হল অনর্থক, দরজা ঠেলে বাড়ির ভিতর ঢুকতে ঢুকতে ভাবছিল কমলিকা। উঠোন থেকেই ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজ কানে গিয়েছিল, হাঁপানির রোগীর নিঃশ্বাস যেমন হয়। কমলিকা জুতো জামা ছাড়বার সময় পেল না, ছুটে গেল শ্বশুরের ঘরের দিকে।

রুদ্রপ্রসাদ হাঁপানির টানে খুব কষ্ট পাচ্ছেন, শ্বাশুড়ি কী করবেন জানেন না, তাই পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। কমলিকা নিজের কথা, মিঠুর কথা, ভাববার সময় পেল না, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'মা, আপনি আর একটুকাল দেখুন, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।'

ডাক্তার পাল বয়োবৃদ্ধ মানুষ, রুদ্রপ্রসাদের বন্ধু স্থানীয়। উনি বললেন, 'তুমি ঘরে যাও, বৌমা, আমি আধঘন্টার মধ্যে আসছি। আর দু'তিনজন রোগী আছে।'

কমলিকা ব্যাকুল হয়ে বলল, 'না, না, বাবার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। আপনি এখুনি আসুন। আমার বড্ড ভয় করছে।'

ডাক্তার পাল অভিজ্ঞ ডাক্তার, উনি জানেন, হাঁপানির রোগীদের অমন অবস্থা মাঝে মাঝে হয়, এতে ভয় পাবার কিছু নেই।' কিন্তু কমলিকা নাছোড়বান্দা, উনি বাধ্য হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কমপাউণ্ডারকে বললেন, 'সুজিত, ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলো, আমি এখুনি ফিরে

আসব।' বলে-ব্যাগের মধ্যে কয়েকটা ওষুধপত্র ঢুকিয়ে নিয়ে কমলিকাকে বললেন, 'চলো, বৌমা।'

ডাক্তার এসে রুদ্রপ্রসাদের শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন, রক্ত চাপ নির্ণয় করলেন, তারপর একটা ইনজেকশন দিলেন। ইনজেকশনের পাঁচ মিনিটের মধ্যে রুদ্রপ্রসাদের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হল, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ডাক্তার কমলিকা এবং তার শ্বাশুড়ির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আমি আসি। কাল কেমন থাকেন, একটা খবর দিয়ো। পারলে মনিকেও খবর দিয়ো একটা।'

কমলিকা শঙ্কিত মুখে জিগ্যেস করল, 'ভয় পাবার কিছু নেই তো?'

ডাক্তার উত্তরে বললেন, 'আরে, আমাদের বেঁচে থাকাটা হল একটা অ্যাক্সি-ডেণ্ট। ভয় পেতে হলে, তার শেষ নেই। সারাটা জীবন ভয়ে ভয়েই কাটাতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন? জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনা হীন। জীবন এবং মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বানিয়ে রেখে দাও, ব্যস্, আর চিন্তা কী? আচ্ছা, আসি এখন।

কমলিকা বলল, 'দাঁড়ান, আপনার ভিজিট—'

ডাক্তার বাধা দিলেন, 'এখন থাক, কয়েকজন রোগী বসে আছে। রবিবার সকালে ডিস্পেনসারিতে এসো একবার, তখন হিসেব করে' বলে দেব।' তারপর মনির মায়ের দিকে ফিরে বললেন, 'বৌঠান ভাববেন না। দেখুন, ঘরের পাশে ডাক্তার থাকলে কত সুবিধে।'

মনির মা হাসবার মতো মুখের একটা ভংগী করলেন, ডাক্তার পাল ব্যাগ তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

শ্রান্তিতে কমলিকার পা ভেঙে আসছিল, কিন্তু, বিশ্রামের উপায় নেই। মিঠুটাকে যাহোক দুটো খাইয়ে দিতে হবে, তারও সময় নেই। আবার বাড়ি থেকে বেরুল কমলিকা। দুটো বাড়ি পরেই ফুলু আর তার দিদি থাকে। কমলিকা ফুলুদের বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল।

ভাগ্যক্রমে ওরা বাড়িতেই ছিল, কমলিকা ফুলুর হাতে দুটো দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, 'ফুলু, তোমাকে ভাই, এখুনি একটা কাজ করতে হবে। বাবার শরীর ভীষণ অসুস্থ। ইনজেকশন দিয়ে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়ানো হয়েছে। তুমি ভাই, মিঠুর বাবাকে একটা টেলিগ্রাম করে' দাও। এই কাগজটায় আসানসোলের ঠিকানা লেখা আছে।

ফুলু টাকা আর কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে পায়ে চটি গলাতে গলাতে বলল, আপনি বাড়ি যান, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

রাতে মিঠুকে খাইয়ে কমলিকা শ্বাশুড়ীকে বলল,' বাবা তো ঘুমচ্ছেন, আসুন আমরাও খেয়ে নিই। দেখি, যদি একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে পারি। সারাদিন বড্ড খাটুনি গেছে।'

খাওয়া দাওয়া সেরে নটার মধ্যেই বিছানায় চলে গেল কমলিকা। কিন্তু তাড়াতাড়ি শোবার অভ্যেস কোনো কালে নেই, তাই শরীরটা একটু বিশ্রাম পেল বটে, কিন্তু ঘুম এল না। মায়ের সংগে শোয়, তাই মিঠুরও দেরি করে, ঘুমোনো অভ্যেস হয়ে গেছে। কমলিকা ফিরে তাকিয়ে দেখল, ও এপাশ ওপাশ করছে।

কমলিকা ছেলের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিল, তারপর জিগ্যেস করল, কি রে, আসানসোলে যাবি ?'

বেড়াতে যাবার নামে মিঠু সর্বদাই একপায়ে খাড়া, সে একলাফে বিছানার উপর উঠে বসল, বলল, 'কবে ?'

কমলিকা বলল, 'এখন নয় রে, বোকা! যদি আমরা একদম চলে যাই ওখানে ?'

মিঠু জিগ্যেস করল, 'দাদু ঠাকুমাও যাবে ?'

কমলিকা উত্তর করল, 'হুঁ!'

মিঠু একমিনিট ভাবল, তারপর বলল, 'আমার সেতার শেখায় কী হবে ?'

কমলিকা হেসে বলল, 'তোর মাষ্টার তো পালিয়েছে!'

মিঠু প্রতিবাদ করল, 'সে তো মোটে একমাসের জন্যে। একমাস বাদে শুভদা ঠিক ফিরে আসবে!'

কমলিকা জিগ্যেস করল, 'তুই ওঁকে শুভদা বলিস্ কেন রে ?

মিঠু পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তবে কী বলে ডাকব ?'

কমলিকা বলল, 'কাকু বলতে পারিস না!'

মিঠু আবার প্রশ্ন করল, 'তবে যে ওরা সবাই শুভদা বলে ডাকে ?'

কমলিকা বলল, 'ডাকুক গে।'

মিঠু আবার জিগ্যেস করল, 'কাকু বলে' ডাকবো ?'

কমলিকা উত্তর করল, 'হুঁ'।

মিঠু চোখ বুজে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'আচ্ছা!'

কিছুক্ষণ বাদে মিঠু ঘুমিয়ে পড়ল। কমলিকার অত সহজে ঘুম এল না। একবার শুভর কথা মনে হল, একবার মনির কথা মনে হল, একবার চন্দ্রানীর কথা মনে হল। পাশ ফিরে শুতে শুতে মনে মনে বলল কমলিকা, 'এ টানা পোড়েন আর ভাল লাগে না। কবে আমরা আসানসোলে যাব?'

চোদ্দ

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল কমলিকা। যদিও চিন্তায় ভাবনায় অনেকবার ঘুম ভেঙে গেছে মাঝ রাতে, তবু শরীর অনেক ঝরঝরে হয়ে গেছে। ইনজেকশনের পর রুদ্রপ্রসাদ সেই যে ঘুমিয়েছেন, তারপরে আর ওঠেন নি। মিঠুকে স্কুলের জন্যে প্রস্তুত করে কমলিকা শ্বাশুড়ীকে ডেকে বলল, 'মা, আমি মিঠুকে স্কুলে দিয়ে আসছি। আজ আর অফিসে যাব না। মিঠুর স্কুল থেকে অফিসে একটা ফোন করে দিয়ে আসছি এখুনি।'

মিঠুকে স্কুলে পেঁাছে দিয়ে ফোন-টোন সেরে বাড়ি ফিরে ও দেখল, অনুকুলের হাতে কিছু কাগজ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছে পীযূষ। কাকাবাবু আজকাল কাজকর্ম বিশেষ কিছু দেখেন না। পীযূষই সব করে। কমলিকা অনুকুলকে বলল, 'তুমি এখন যাও। আমি সব সেরে রাখছি, তুমি বেলা তিনটের সময় এসে নিয়ে যেয়ো।'

অনুকুল বেরিয়ে যেতেই কমলিকা কাগজ পত্র নিয়ে বসে পড়ল। কাজ করতে করতেও মনটা থেমে থাকে না। নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করে আসে। স্বপন-মুরারি-গৌতমের কথা মনে পড়ল ওর, কাকাবাবুর কথা, পীযূষের কথা, প্রকাশ সামন্তর কথা, এবং রফিক আলির সংগে লরি-ওয়ালার হাতাহাতির কথা। চন্দ্রানীর কথাও মনে পড়ল ওর; কেন ও আত্মহত্যা করল, বসে বসে ভাবতে লাগল কমলিকা। শুভজিতের সংগে চন্দ্রানীর ঘনিষ্ঠতা কতদূর এগিয়েছিল, অনিবার্য ভাবে সে কথাও ওর মনে হল। শুভজিতের মা-ই এই চিন্তা ওর মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন।

শুভজিৎ লোকটি ভালো, কিন্তু মা-টা যেন কী রকম! কুচুটে, প্যাঁচালো, সন্দেহপরায়ণ। শুভজিতের ভাবনাটাই মনের মধ্যে বারবার ঘুরে ঘুরে আসছিল। শুভজিৎ বেনারস গেছে, বেশ করেছে, কিন্তু ওকে জানিয়ে গেল না কেন? চন্দ্রানীর মৃত্যুর সংগে ওর কাশী যাত্রার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, কে জানে। কয়েকটা চিঠি সই করতে করতে হঠাৎ ওর মনে হল শুভজিৎ কাশীই যাক, আর কামস্কাট্‌কাই যাক, তাতে ওর কি? শুভজিতের কথা ভাবতে গিয়ে মুখটা একটু লাল হল। ভাবল, 'চন্দ্রানীর সংগে শুভজিতের সম্পর্ক যা-ই হোক না কেন, তাতে আমার কি? মণি আসুক, আমি এবার নিশ্চয়ই আসানসোল চলে যাবার ব্যবস্থা করব। মণি হয়তো নানা ওজর আপত্তি করবে, তা করুক গে।

এভাবে সমস্ত দায়িত্ব মাথায় নিয়ে, দিনের পর দিন একটা মুমূর্ষু রোগীর সংগে এক বাড়িতে আর থাকা যায় না। আসানসোলে যাবার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে এবার।'

কাজ করতে করতে সারাক্ষণ মণির আসবার প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে রইল কমলিকা।

বেলা এগারোটায় ঘুম ভাঙল রুদ্রপ্রসাদের, শরীর সুস্থ, হাঁপানির টান একেবারেই নেই, খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে একেবারে হাঁক ডাক লাগিয়ে দিলেন তিনি।'

স্ত্রীকে ডেকে বললেন, বৌমা তো আজ কাজে যায় নি, ওকে ডাকো, ওর সংগে বেরুতে হবে একবার। জুতো জোড়া কবে থেকে ছিঁড়ে গেছে, এখুনি এক জোড়া জুতো কেনা দরকার।' কমলিকা অফিসের কাগজ পত্রের সামনে বসে শুনতে পেল। শ্বাশুড়ী মৃদু আপত্তি জানাতে গিয়েছিলেন, ওঁর তীব্র প্রতিবাদের ঝড়ে সে আপত্তি টিঁকল না। কমলিকা কাগজগুলো একদিকে ঠেলে রেখে শ্বশুরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

কমলিকাকে দেখে বিছানা ছেড়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন রুদ্রপ্রসাদ। বললেন, 'কমল, আমার সংগে মতিয়ুর রহমানের দোকানে চলো। কবে থেকে জুতো জোড়া ছিঁড়ে গেছে।

কিছুতেই আর একজোড়া কেনবার সময় হচ্ছে না। আজ তুমি বাড়ি আছ, চলো আজই যাই।'

শ্বাশুড়ী বললেন, 'এই তো খেয়ে উঠলে, একটু বিশ্রাম করে নাও, তারপর বেরিয়ো।'

শ্বশুর বললেন, 'না, না, আমার শরীর একদম ঠিক আছে, নিঃশ্বাসেরও কোনো কষ্ট নেই। চলো বৌমা, আজই চলো। কাল আবার কেমন থাকব, কে জানে?'

কমলিকা বলল, 'চলুন।'

রামচরণের রিক্সায় চেপে কমলিকাকে নিয়ে মতিয়ুরের দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন রুদ্রপ্রসাদ। দোকানে পেঁছে জুতো বাছতেই দিন কাবার করে ফেললেন তিনি। কমলিকা একটু চিন্তিত হল। অনুকুল তিনটের সময় আসবে কাগজ পত্র ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অবশ্য, কাগজপত্র সবই প্রায় দেখা হয়ে গেছে, শুধু গোটা তিনেক সই করতে বাকি।

রুদ্রপ্রসাদ দোকানের মালিক মেহ্‌মুদকে ডেকে বললেন, 'মতি কোথায় গেল? মতিকে ডাকো দেখি! ও আমার অনেক কালের বন্ধু। ও ঠিক জানে, আমার কী রকম জুতোর দরকার।'

মেহ্‌মুদ মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'উনি তো বছর দুই হল মারা গেছেন।'

রুদ্রপ্রসাদ মেহ্‌মুদের কথায় কর্ণপাতই করলেন না, 'কী বলছ তুমি? পাগল নাকি? গতমাসেই তো মতির সংগে আমার একঘণ্টা ধরে কথা হল! যা ইচ্ছে একটা বলে দিলেই হল! ডাকো মতিকে?'

মেহমুদ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, উনি বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি তো বাপু সেদিনের ছেলে! মতির সংগে আমার চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব। মতি আমাকে 'দত্ত সাহেব' বলে ডাকে, আমি ওকে 'মতিবাবু' বলি।' বলে, নিজের রসিকতার আনন্দে হা হা করে হেসে উঠলেন রুদ্রপ্রসাদ।

মেহ্‌মুদকে চুপ করে থাকতে দেখে উনি আবার তাড়া লাগালেন, 'কি হে ছোকরা, মতিকে ডাকো শিগগির!'

মেহ্‌মুদ উপায়ান্তর না দেখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কমলিকার চোখের ইঙ্গিতে থেমে গেল। কমলিকা ওকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রুদ্রপ্রসাদের শারীরিক অবস্থার কথা জানাল। মেহ্‌মুদ মৃদুস্বরে বলল, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি, কী করা যায়।' রুদ্রপ্রসাদ তখনও প্রায় পঁচিশ জোড়া জুতোর মাঝখানে বসে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। মেহ্‌মুদ ওঁর সামনে গিয়ে বলল,

'একটা কাজে আব্বাজান একটু বাইরে গেছেন। যাবার সময় আপনার কথাই বলছিলেন। আপনার কোন জুতোর দরকার আমায় বলে গেছেন। আমি জুতো বেছে দিচ্ছি, আপনি চিন্তা করবেন না।

মেহ্মুদ ওঁর পায়ের মাপ নিয়ে একজোড়া জুতো বেছে দিল; মেহ্মুদের সৌভাগ্য, জুতো জোড়া ওঁর পছন্দ হল। উনি একমুখ হেসে বললেন, 'বাঃ ঠিক জুতো জোড়া বার করে দিয়েছতো! তা, হবে নাই বা কেন? মতিবাবুর ছেলে তুমি, তোমার কখনো ভুল হতে পারে? কী বলো বৌমা, জুতোজোড়া ঠিক হয় নি?'

কমলিকা দাম মিটিয়ে দেবার পর বেরিয়ে যাবার মুখে উনি ফিরে দাঁড়িয়ে মেহমুদ্‌কে বললেন, 'মতিকে বোলো, আজ দেখা হল না। আমি পরে আর একদিন আসব।'

মেহ্মুদ স্মিত মুখে ঘাড় নাড়ল।

জুতো কিনে বাড়ি ফিরে কমলিকা দেখল ইতিমধ্যে মণি এসে পড়েছে আসানসোল থেকে। মণিকে দেখে নিশ্চিন্ত হ'ল কমলিকা, খুশিও হ'ল। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, মণি যেন একটু বিরক্ত। বাবা দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন, জুতো কিনতে মতিয়ুরের দোকানে যাচ্ছেন, আর তাঁরই অসুখের সংবাদ জানিয়ে ওকে দেড়শো কিলোমিটার দূর থেকে টেনে আনা হয়েছে। বিশেষ করে, ওর এখন আর ছুটি পাওনা নেই।

মণির উষ্মা দেখে কমলিকার মন একটু অপ্রসন্ন হল, ও বলল, 'কাল বাবার খুব বাড়াবাড়ি গেছে, ইনজেকশন দিয়ে সামলানো হয়েছে, রাত্তিরে সব কথা বলব।'

মণিকে দেখে তার মায়ের মুখে হাসি ধরে না। একটা মাত্র ছেলে, ন'মাসে ছ'মাসে দেখা হয়, তাই যখনই মণি আসে, ওঁর মনের ভিতর বাৎসল্যের বান ডেকে যায়। উনি এসে বললেন, 'খোকা, তুই বাজারে যা একবার। বেলা চারটে বাজে, এতক্ষণে বিকেলের বাজার বসে গেছে। বড়ো দেখে একটা রুই মাছ নিয়ে আয়। অনেকদিন ভাল করে মাছ রাঁধিনি।'

মণি মাছ এনে দিলে কমলিকাই মাছটাকে কেটে কুটে দিল। তারপর কিছু মশলা পিষে দিল শিল নোড়ায়। মা ইতিমধ্যে কয়েকটা কাঁচা আম কেটে ফেললেন অম্বল রাধবার জন্যে।

কমলিকা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল, বলল, 'অনেক দেরী হয়ে

গেল, আমি চট করে গিয়ে মিঠুকে নিয়ে আসছি। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ও হয়তো দারোয়ানের কাছে একলা চুপটি করে বসে আছে।'

কমলিকা বেরিয়ে গেল, মা রান্না করতে লাগলেন, মণির মায়ের কাছে একটা টুল পেতে বসে, গল্প করতে লাগল। সারাদিন অসহ্য গরমে সমস্ত কলকাতা শহরটা খাবি খাচ্ছিল। এমন সময় মণির গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল মণি, বোধহয় বৃষ্টি হবে। গরমে সারা শরীর রসগোল্লার মতো চট চট করছে, একটু বৃষ্টি হ'লে বাঁচা যায়। মণি বলল, 'যাই, একটু ঘুরে আসি। অরূপ আর রতনের সংগে দেখা করে আসি।

মা একটু শঙ্কিত হলেন, বললেন, 'এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে, দু ঘণ্টার মধ্যে আমার রান্না হয়ে যাবে। তুই সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরিস। দুপুরে বিশেষ কিন্তু খাওয়া হয় নি, সন্ধ্যে বেলায় সকাল-সকাল খেয়ে নিবি। বেশি দেরী করলে বৌমা কিন্তু রাগ করবে বলে দিচ্ছি।'

'না, না, আমি যাব আর আসব। অনেকদিন ওদের সংগে দেখা হয় নি, দুটো কথা বলেই চলে আসব। মণি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

কমলিকা মিঠুর স্কুলের দরজায় পেঁছিতে না পেঁছিতে হুড় মুড় করে বৃষ্টি নামল। একেবারে প্রবল বর্ষণ। স্কুলবাড়ির মধ্যে ঢুকে জলের হাত থেকে কোনো মতে আত্মরক্ষা করল সে।

মিঠুকে দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল ও। স্কুল ভেঙে গেছে অনেকক্ষণ। টুলের উপর একলা বসে আছে মিঠু। দারোয়ান বোধ হয় চাপাটি গড়তে গেছে। কমলিকা মিঠুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল, ভাবল, আমার আবার দুঃখ কিসের? আমার একদিকে স্বামী, অন্যদিকে ছেলে। কত লোকের কত রকমের বেয়াড়া ছেলে হয়, তাদের নিয়ে জ্বলে পুড়ে খাক হয় মা-বাপ। হঠাৎ বুদ্ধের কথা মনে পড়ে গেল কমলিকার। ভাগ্যিস, আমার ছেলে অমন নয়। ছেলেও ভাল, স্বামীও ভাল। হয়তো সব বিষয়ে স্বামীর সংগে মতের মিল হয় না, কিন্তু তাতেই বা কী? দুটো আলাদা আলাদা মানুষের দুটো আলাদা আলাদা মন; সব সময় দুটো মতের মিল হওয়া কি সম্ভব? মাঝে মাঝে মনোমালিন্য হওয়াই তো স্বাভাবিক। ও সব ঝগড়া বিবাদ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মিঠুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, মঠুবাবু তোমার বাবা এসেছে আজ।'

খিদেয় মিঠুর পেটের ভিতর চুঁই চুঁই করছিল, কিন্তু বাবার নাম শুনে

ওর মুখে হাসি ফুটল। বলল, 'চলো মা, বাড়ি যাই।'

বাইরের দিকে তাকিয়ে একেবারে ভয় পেয়ে গেল কমলিকা। সারা বছরের বৃষ্টি আজ বোধ হয় একদিনেই হবে। তিন মিনিটও হয় নি এখনও এর মধ্যেই গোড়ালি ডুবে যাবার মতো জল জমে গেছে রাস্তায়। এ ভাবে যদি আধঘণ্টা বৃষ্টি হয়, তবে এক-মানুষ-সমান জল দাঁড়িয়ে যাবে। রাস্তায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখল, যদি একটা রিক্সা পাওয়া যায়। রিক্সা পাওয়াও গেল একটা। রিক্সাটা জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম ভিজছে, আর বেচারা রিক্সাওয়ালা ফুটপাথের একেবারে শেষ প্রান্তে বাড়ির দেয়ালের গায়ে গা লাগিয়ে কোনো মতে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করছে। কমলিকা গলা বাড়িয়ে ডেকে বলল, 'ভাড়া যাবে?'

রিক্সাওয়ালা প্রবল বেগে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'নেহি।'

কমলিকা বলল, 'বেশি পয়সা দেব, চলো।'

রিক্সাওয়ালা জিগ্যেস করল, 'কাঁহা যায়ে গা?'

কমলিকা রিক্সাচালকের কাছে গন্তব্য স্থান নির্দেশ করল। সাধারণ দিনে ঐ দূরত্বের ভাড়া তিন চার টাকা, রিক্সাওয়ালা একেবারে বিশ টাকা হাঁকল। কমলিকা বলল, 'তাই দেব বাবা, রিক্সাটাকে এদিকে নিয়ে এসো।

রাস্তা জলে ভেসে যাচ্ছে এবং বৃষ্টির তখনও বিরাম নেই।

রিক্সায় বসে শুধু সাঁতার কাটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। আর কোনো দিকে কোনো সুবিধে হল না। সর্বাঙ্গে অশ্রুপাত করতে করতে মায়ে ও ছেলেতে বাড়ির দরজায় সামনে এসে নামল।

নিজে শুকনো জামা কাপড় পরে' এবং ছেলেকে শুকনো জামা কাপড় পরিয়ে রান্না ঘরে এসে কমলিকা দেখল, মণি যথারীতি নেই, ঝড় হল মাথায় করে প্রতিবারের মতো এবারও ও বন্ধুদের সংগে দেখা করতে গেছে। শ্বাশুড়ী আড় চোখে তাকিয়ে দেখলেন, কমলিকার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। কমলিকা মনে মনে ভাবছিল, মণির উপর ও প্রসন্নই থাকতে চায়, কিন্তু মনির বিবেচনা বোধ এতই অল্প যে প্রসন্ন থাকা সম্ভব নয়। মিঠুকে জলখাবার দিয়ে বিরক্ত মনে ও শ্বাশুড়ীকে রান্নার কাজে সাহায্য করতে বসে গেল।

সাড়ে সাতটার মধ্যে রান্না চুকে গেল। একবার ভাবল, নিজই বেরিয়ে গিয়ে মণিকে ডেকে নিয়ে আসবে কিনা। বাইরের দিকে তাকিয়ে, রাস্তার অবস্থা দেখে শঙ্কিত হল কমলিকা। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ কিন্তু

গলির মধ্যে অন্ততঃ হাঁটু জল। এর মধ্যে বাইরে বেরুলে আবার স্নান করে কাপড় ছাড়তে হবে। মণিই বা ফিরবে কি করে?

আটটায় সময় মিঠুকে এবং শ্বশুরকে খেতে বসিয়ে দিল সে। বেশ কয়েক দিনের পর রুদ্রপ্রসাদ বেশ সুস্থ, তাই তারিয়ে তারিয়ে সব রকম খাবার চেয়ে-চিন্তে চেখে চেখে খেল। মাছ খেতে দিলে মিঠু গোলমাল করে, কাঁটা বাছতে পারে না ফেলে ছড়িয়ে উঠে যায়। তাই কমলিকা ওকে খাইয়ে দিল।

মিঠুর খাওয়া হলে কমলিকা ওকে ঘরে পাঠিয়ে ছিল, বলল, কাল স্কুলে হোমওয়ার্ক দেখাতে হবে, যা করগে যা।

দাদুর সংগে মিঠুর খুব ভাব, আজ দাদুর শরীরটা ভাল, তাই মিঠুর উঠবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মায়ের কথার অবাধ্য হলে বিপদ ঘটতে পারে, তাই অপ্রসন্ন মনে উঠে গেল সে। শ্বশুরের খাওয়ার সামনে বসে রইল কমলিকা।

মণি আজ অন্য দিনের মতো অত দেরি করল না, সাড়ে নটা নাগাদ ভিজে কাকের মতো এসে হাজির হল। হাত পা ধুয়ে শুকনো জামা কাপড় পরে মণি এসে উপস্থিত হল রান্নাঘরে। আজকের সমস্ত রান্না মণিকেই কেন্দ্র করে, তাই তার মা সব খাবার আবার নতুন করে, গরম করতে বসালেন। মণির খাওয়া শেষ হলে শ্বাশুড়ী-বৌ একসংগে বসে গেলেন খেতে।

খাওয়া সেরে রান্নাঘর পরিস্কার করে কমলিকা যখন নিজের ঘরে গেল, তখন প্রায় এগারোটা বাজে। ঘরে ঢুকে দেখে বাপ ছেলেতে বিছানার উপর মল্লযুদ্ধ চলছে। বালিশ গুলো মাটিতে লুটোচ্ছে, চাদরের আদ্দেকটা বিছানার বাইরে ঝুলছে, ঘরের কোনের মোড়াটা মেজের ওপর শুয়ে আছে। মণির সংগে মিঠুর খুব ভাব। মাকে ভালবাসে বটে কিন্তু ভয়ও করে। কিন্তু বাপের সংগে ওর একেবারে গলায় গলায়।

ঘরের ঢুকে দুজনের কাণ্ড দেখে গা জ্বলে গেল কমলিকার। ধমক দিয়ে বলল, 'এই হতভাগা ছেলে, তুই হোম ওয়ার্ক শেষ করেছিস্?' মিঠু উত্তর দেওয়ার আগেই মণি বলে' উঠল, 'কই, কী হোম ওয়ার্ক আছে দেখি, আমি সাহায্য করছি তোকে।'

কমলিকা কড়া চোখে মণির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি মিঠুর সঙ্গে কথা বলছি, তুমি চুপ করো।' তারপর ছেলের দিকে ফিরে বলল, 'কিরে, করেছিস তোর হোম ওয়ার্ক?'

মিঠু কাচু মাচু মুখে উত্তর করল, অনেক গুলো অংক যে, এখনও শেষ হয় নি।'

কমলিকা বলল, 'ঘরের ঐ কোনে বসে হোমওয়ার্ক শেষ কর্, নইলে ঘুমুতে যেতে পাবি না।' মণির দিকে ফিরে বলল, 'আমি যখন স্কুলের ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বলব, তুমি চুপ করে থাকবে, ও যদি হোমওয়ার্ক না নিয়ে যায়, আমাকে নালিশ শুনতে হয়, তোমাকে নয়।'

স্ত্রীর রণচণ্ডী মূর্তি দেখে মণি আর কথা বাড়াল না, একটা সিগারেট হাতে নিয়ে বারান্দায় চলে গেল। মিঠুর হোমওয়ার্ক শেষ করতে দশ মিনিটের বেশি লাগল না।

কমলিকা অফিসের কয়েকটা চিঠি অনুকূলের হাতে ফেরত দিতে পারে নি, সেগুলো নিয়ে মেজের উপর বসে পড়ল সে; মিঠুকে বলল, 'যা, এবার শুগে যা!' বারান্দার দিকে তাকিয়ে মণিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমিও শুয়ে পড়ো। আমার আরও মিনিট পনেরো লাগবে।'

চিঠি পত্র চুকিয়ে মুখ তুলে কমলিকা দেখল, বাবা আর ছেলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে। ওদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে, তারপর আরও দুচার মিনিট এটা ওটা করে বিছানার ধারে দাঁড়াল কমলিকা। মণি পাশ ফিরে জড়িত স্বরে জিগ্যেস করল, 'তোমার হল?' বিছানায় বসে' চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কমলিকা বলল, 'এবার আমাদের আসানসোলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।'

মণি আবার পাশ ফিরল, তারপর বলল, 'আর কিছু দিন সবুর করো। পারলে ইতিমধ্যে তোমার চাকরি থেকে আরও কিছু জমিয়ে নাও। আমরাও সিগ্‌গির প্রোমোশন হবার কথা। প্রোমোশনটা হয়ে গেলে মাইনেও শ'দেড়েক বেড়ে যাবে, একটা ষ্টাফ কোয়ার্টারও পাব। ব্যস্, তারপর আর চিন্তা নেই।'

কমল জিগ্যেস করল, কবে প্রোমোশন পাবে?

মণি উত্তর করল, 'তা কি বলা যায়? ছ'মাসেও হতে পারে, আবার বছর দেড়েকও লাগতে পারে। ভেকেন্সি হওয়া চাই তো?

কমল জিগ্যেস করল, 'যদি ভেকেন্সি না হয়?

মণি বলল, 'ভেকেন্সি হতেই হবে। দুদিন আগে বা পরে।'

কমল বলল, 'আমাকে একবার নিয়ে যাবে?'

মণি মুখ তুলে জিগ্যেস করল, কোথায় ?—আসানসোলে ?'

কমল উত্তর করল, 'হ্যাঁ।'

মণি বলল, 'কিভাবে নিয়ে যাবো বলো। আমি থাকি পাঁচজনের সঙ্গে মেস বানিয়ে। বাড়তি জায়গাও নেই, আমাদের খাওয়া শোয়ারও ঠিক নেই। তার মধ্যে তোমরা থাকবে কোথায় ?'

কমলিকা বলল, 'পাঁচ বছর হয়ে গেল, তুমি আসানসোলে চলে গেছ। মাসে, দুমাসে একবার করে, একদিন-দেড়দিনের জন্যে দেখা হয়। আমার আর এভাবে ভাল লাগছে না।'

—'তাতো বুঝলাম। আমারও কি একলা থাকতে ভাল লাগে ? মাইনে কত পাই, তা তো জানোই। এখানকার একটা খরচা আছে। বাবা আর ক'টাকা পেনসন পান, বলো! তোমার রোজগারটা আছে, তাই রক্ষে। প্রোমোশন পেয়ে গেলে স্টাফ কোয়ার্টারও পাবো। তখন আর বিশেষ অসুবিধে হবে না। তোমার চাকরি গেলে এখানেও তো মাসে মাসে কিছু পাঠাতে হবে। এখন তবু যাহোক কিছু জমছে, তখন সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

কমলিকা বলল, 'এখানে পাঠাতে হবে কেন ? বাবা মাও সঙ্গে যাবেন।'

মণি বলল, 'তা কি করে' হয় ? এ বাড়িটার কী হবে ?

কমলিকা বলল, 'বাবা অত্যন্ত অসুস্থ। কাল ভীষণ বাড়াবাড়ি হয়েছিল। আজ অনেকদিন বাদে একটু ভাল আছেন। শুধু মায়ের ভরসায় বাবাকে এখানে ফেলে যাওয়া যাবে না।'

মণি বলল, 'ত বুঝলাম। কিন্তু বাড়িটারও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

কমলিকা বলল, 'বাড়ি বেচে দাও। এখানে যখন থাকাই হবে না, তখন বাড়িটা রেখে লাভ কী ? বরং হাতে কিছু পয়সা আসবে।'

মণি বলল, 'তা কি হয় ? এতদিনের ভিটে হাতছাড়া হয়ে যাবে ? বাবা বড্ড দুঃখ পাবেন।'

কমলিকা বলল, 'তা হ'লে ভাড়া দিয়ে দাও।'

মণি বলল, 'আজকাল যা দিনকাল পড়েছে, তাতে ভাড়া দিতে ভরসা হয় না। ভাড়া দিলে বাড়ি বেহাত হয়ে যাবে। তাছাড়া, এখানে পাল ডাক্তার আছেন, নানা রকম হাসপাতাল, নার্সিং হোম আছে, এখানে বাবার চিকিৎসার যেমন সুবিধে, ওখানে কি তেমন হবে ?

কমলিকা বলল, 'ওঁরা আসানসোলে ভালই থাকবেন। আরও হাজার হাজার বয়স্ক মানুষও আসানসোলে থাকেন। তারা যখন ওখানে থাকতে পারছেন, বাবাও পারবেন।'

মণি এবার ধৈর্য হারাল, বলে উঠল, 'ওঁরা আমার বাপ মা, তাই গ্রাহ্যি করছ না, নিজের বাপ মা হ'লে বুঝতে।'

মণির এই অভিযোগ এমনই ভিত্তিহীন যে কমলিকা আর স্থির থাকতে পারল না। কেঁদে ফেলল। চোখের জল মুছে ভাঙা গলায় বলল, 'তুমি ছাড়া এমন কথা আর কেউ মুখে আনত না। আমি স্ত্রী হিসেবে আর মা হিসেবে তোমার এবং মিঠুর ওপর যতটা কর্তব্য করেছি, তার থেকে বেশি করেছি, পুত্রবধূ হিসেবে আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রতি। তুমি অন্ধ, তাই চোখে দেখতে পাওনা।'

মণি বুঝল, তার অন্যায় হয়ে গেছে। সত্যিই তো কমলিকা দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে মণির সংসারের ঘানি টানছে। মণি উঠে বসে দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'রাগ করোনা, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। কীভাবে কী করব, বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, পরের বার যখন আসব তোমাদের নিয়ে যাবো। যদি দেখি, সবাই মিলে ওখানে থাকা যাবে, তবে তোমরা থেকে যাবে। তখন বাড়িটার যাহোক একটা ব্যবস্থা করলেই হবে!'

মণি কমলিকাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মাথা রাখল। তারপর আবার শুয়ে পড়ে ওকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বলল, 'এসো, আমার কাছে এসো। রাগ কোরো না।'

মণির বাহুবন্ধনের মধ্যে শুয়ে রইল কমলিকা। মণির আদরের প্রত্যুত্তরে ও সাড়া দিল বটে, কিন্তু ওর মনটা অন্য একটা জগতে বিচরণ করতে লাগল।

সেই জগতে রুদ্রপ্রসাদ কাকাবাবু নেই, মণি-শুভজিৎও নেই। মৃত চন্দ্রানীর কথা মনে পড়ল একবার। মিঠুর কথা ভাবল, মিঠুর ভবিষ্যতের কথা। ওর মনটা প্রায়-অচেনা আসানসোলের ফুলের বাগান ঘেরা ততোধিক অচেনা ছোট্ট একটা বাড়ির আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মণি যখন পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, তখনও কমলিকা খোলা জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের পানে চেয়ে বাগান ঘেরা অচেনা বাড়িটার কথা ভাবতে লাগল।

পনেরো

একটা মাস কাশীতে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এল শুভজিৎ। চন্দ্রানীর মৃত্যুতে ওর মনের ভারসাম্য কিছুটা বিচলিত হয়েছিল, কাশীতে গুরুদেবের সাহচর্যে সেটা প্রায় ফিরে এল। কলকাতায় ফিরে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখে, সেখানে বিরাট হৈ চৈ পড়ে গেছে। সমস্ত পাড়াটাকে তোলপাড় করে সকলে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

ঘরের দরজায় মায়ের সংগে দেখা হল শুভজিতের। ওর আসবার প্রতীক্ষায় তিনি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। শুভজিৎকে দেখে মায়ের মুখে হাসি ফুটল। হাতের ব্যাগটা গলির মধ্যে নামিয়ে রেখে মাকে প্রণাম করল শুভজিৎ। মা ওর চিবুক স্পর্শ করে, মুখে হাত ঠেকালেন, তারপর বললেন, 'মানিকের ছেলেকে সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘণ্টা চার পাঁচ হল। মানিক, প্রীতি, ওরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। তুই রাস্তার কাপড় জামা ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে ফ্যাল্, আমি দুটো জলখাবারের ব্যবস্থা করি। তারপর একবার ওদের বাড়ি যা।'

শুভজিৎ বলল, 'জলখাবার লাগবে না ; তুমি এক কাপ চা বানিয়ে দাও। তারপর চান-টান সেরে একেবারে ভাত খাবো। খবরের কাগজটা ওল্টাতে ওল্টাতে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল শুভজিৎ। এমন সময় পাঁচু এসে হাজির হল। শুভজিৎকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি এসে গেছো ? এদিকে কী হয়েছে শুনেছ বোধহয়।'

শুভজিৎ মায়ের কাছে বুদ্ধের অন্তর্ধানের সংবাদ পেয়েছিল, তবু জিগ্যেস করল, 'কী ?'

পাঁচু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর বলল,

'বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করেছেন।'

শুভজিৎ না বোঝার ভান করে জিগ্যেস করল, 'তার মানে ?'

পাঁচু উত্তর করল, 'মানিকের বজ্জাত ছেলেটা কোথায় পালিয়ে গেছে।'

শুভজিৎ জিগ্যেস করল, 'পালালো কীভাবে ?'

পাঁচু এবার শুভজিতের দিকে তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেরাল, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, তাই যদি জানব তাহলে কি পালাতে দিই !'

শুভজিৎ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'তা বটে।'

পাঁচু সারা সকাল বুদ্ধকে খুঁজে বেড়িয়েছে, কোনো লাভ হয় নি। ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে সে একেবারে আগুন হয়ে ছিল। বলল, যেমন মানিক, তেমনি তার বৌ। দুটোই সমান অপদার্থ। ছেলেটাকে একেবারে জন্তু বানিয়ে তুলেছে। ও ছেলে যদি আমার হত, আমি চাবকে একেবারে সিধে করে দিতাম।'

শুভজিৎ পাঁচুকে একেবারেই দেখতে পারে না। পাড়ার সবার সংগে পাঁচুর ঝগড়া। মানিক বিশ্বাসের মতো ঠাণ্ডা মানুষ নিতান্তই বিরল, তাই পাঁচুর সংগে তার বন্ধুত্ব এখনও টিঁকে আছে।

শুভজিৎ পাঁচুর কথার উত্তর দিল না। পাঁচুর কথার ন্যায্য উত্তর দিলে এখুনি ওর সংগে লাঠালাঠি বেধে যাবে। ও শুধু বলল, 'মানিকদাকে বলুন না, উনি যেন কুষ্ঠি দেখে বলে দেন। কোথায় বুদ্ধকে খুঁজে পাওয়া যাবে।'

পাঁচু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শুভজিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিকুচি করেছে তোমার কুষ্ঠির। আমি কতদিন ওকে বলেছি, ও ছাই পাঁশ নিয়ে মাথা না ঘামাতে, কিন্তু কে কার কথা শোনে?'

শুভজিৎদের বাড়ি আর মানিকদের বাড়ি পাশাপাশি, দুটো বাড়ির একই দেয়াল। দুটো বাড়িই দোতলা, কিন্তু মানিকদের বাড়ির দোতলাটা সম্পূর্ণ নয়, দোতলার সামনে এবং পিছনে কিছুটা জায়গা ফাঁকা পড়েছিল এবং সেই জায়গায় বহুদিন আগেকার মরচে ধরা অব্যবহার্য একটা ট্যাংক ছিল। ট্যাংকটার আশে পাশে বেশ কিছুটা জায়গা ছিল বুদ্ধের লুকোনোর জায়গা।

বুদ্ধ বিশ্বাসের স্বভাবের সংগে সিদ্ধার্থ গৌতমের স্বভাবের একজায়গায় মিল ছিল। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের সংগে এদের চিন্তার আদৌ সমতা ছিল না। বুদ্ধের জগতটা আর পাঁচজনের জগতের থেকে এত তফাৎ যে অনেকেই বুদ্ধকে ঠিকমতো বুঝত না, এবং সে কারণে বুদ্ধের জন্যে তাঁদের সংগে মন কষাকষি হত মানিকের। শুভজিৎ গোড়া থেকেই বুদ্ধকে বুঝেছিল, তাই মানিকের সংগে বুদ্ধকে কেন্দ্র করে' ওর কখনো অশান্তি হয় নি।

শুভজিৎ চা খেতে খেতে ভাবছিল, কী করা যায়। ও জানত, বুদ্ধ কোথায় আছে, সেইজন্যে আদৌ বিচলিত হয় নি। বুদ্ধের লুকোনোর জায়গাটা শুভজিৎ ছাড়া আর কেউ জানে না। পাড়ার সবাই মানিকের

বাড়ির আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছে ; এখন যদি ও বুদ্ধকে নিয়ে ডাকে, তবে সবাই জায়গাটার সন্ধান পেয়ে যাবে। কিন্তু তা ছাড়া আর কোনো উপায় এখন আর নেই।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ও উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে একটা নিজে ধরাল, অন্যটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল মানিকের বাড়ির দিকে। মানিকের বাড়ির জানলাটার বাইরে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে মুখ তুলে ও ডাকল, 'এই বুদ্ধ, এদিকে আয়।' উপর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আশে পাশে যারা ছিল, তারা শুভজিতের পাশে এসে দাঁড়াল এবং উপরের দিকে মুখ তুলে এদিক ওদিক চাইতে লাগল।

কোনো সাড়া না পেয়ে শুভজিৎ বুঝল, বুদ্ধের তখনো ধ্যান ভঙ্গ হয়নি, সে গলা ছেড়ে আবার ডাক দিল, বলল, 'এদিকে আয়, দ্যাখ্, তোর জন্যে কী এনেছি।'

এবার বুদ্ধের মুখটা সকলের দৃষ্টিগোচর হল। বুদ্ধ আকাশের দিকে চাইতে চাইতে বলল, 'তুমি কখন এলে?'

গলির মধ্যে এখন পনেরো ষোল জন লোক সবাই হৈ চৈ করে উঠল। একজন চেঁচিয়ে ডাকল, ছাদের কার্নিশ থেকে ঝুঁকে বুদ্ধকে ধরবার চেষ্টা করল। পাঁচুর পাশে মানিক দাঁড়িয়ে। প্রীতি কাঁদতে কাঁদতে গলিতে নেমে এল।

জনতার মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ছেলেটা ওখানে গেল কীভাবে?'

পাঁচু বলল, 'কীভাবে আর? ছাদ থেকে এক লাফে নেমে গেছে। আগের জন্মে ছেলেটা হনুমানের বাপ ছিল।'

অন্য একজনকে বলতে শোনা গেল, 'ওখান থেকে এখন বেরুবে কী ভাবে?'

আর একজন মন্তব্য করলেন, 'সে আর এমন কি শক্ত কাজ? আর এক লাফে গলিতে এসে নামবে।'

শুভজিৎ বলল, 'কি রে, এবার নামবি নাকি?'

বুদ্ধ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ছাদের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'এখন নামব না, পেঁচো মারবে। তুমি আমায় একটা সিগারেট দাও।'

পাঁচুকে আড়ালে 'পেঁচো' বলে না। এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। তাদেরই কারো কাছ থেকে বুদ্ধও শিখে ছিল। কিন্তু সব কথা সব জায়গায়

বলতে নেই, ক্ষুদ্রবুদ্ধি বুদ্ধের এ বুদ্ধি ছিল না। সে অসংকোচে পাঁচু লাহিড়ীর গুপ্ত নাম সকলের সামনে উদ্ঘাটিত করল।

গলির মধ্যে সকলেই হেসে মুখ ফেরাল। মানিক পাঁচুর পাশেই দাঁড়িয়ে, সে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করল পাঁচু চেঁচিয়ে উঠল, 'আগে তোকে হাতের কাছে পাই। তোর হাড় এক ঠাঁই, মাস এক ঠাঁই করব।'

বুদ্ধ সিগারেটে একটা টান দিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আজ কাজে যাওনি যে?'

পাঁচু উত্তর করল, 'একবার তোকে হাতের কাছে পাই তো তোকে বুঝিয়ে দেব, কেন কাজে যাইনি।' তারপর মানিকের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি আমার কোমর ধরে থাকো, আমি ঝুঁকে পড়ে ওকে ধরছি।'

মানিক বলল, 'কি দরকার ঝামেলায়? যখন খিদে পাবে তখন নিজেই নেমে আসবে।'

পাঁচু তীব্র প্রতিবাদ করে বলল, 'না, না, না, ও ভালমানুষিতে সিধে হবার ছেলে নয়। এই করেই তুমি ওর ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে তুলছ।'

মানিক আর তর্ক করল না। বুদ্ধের এখন পনেরো বছর বয়স। এই পনেরো বছর ধরে মানিক চেষ্টার ত্রুটি করেনি, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের অনেকেই বোঝাতে পারেনি, বুদ্ধের অস্বাভাবিক ব্যবহারের পিছনে মানিক বা প্রীতির অবদান কিছুমাত্র নেই। বুদ্ধের ব্যবহারে যা দোষ, তা একেবারেই জন্মগত।

পাঁচু কার্নিশের উপর থেকে ঝুঁকে বুদ্ধের দিকে হাত বাড়াল, মানিক ওর কোমর ধরে দাঁড়িয়ে রইল। পাঁচুর হাত বুদ্ধের গায়ে লাগতে না লাগতেই বুদ্ধ অন্য দিকে সরে গেল। পাঁচু টাল সামলাতে পারল না, দোতলা থেকে একতলার গলির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল। পাঁচুর পরনের কাপড় মানিকের হাতে রয়ে গেল। সকলে 'হায়' 'হায়' করে' চেঁচিয়ে উঠল, মানিক সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এল। পাঁচুর ধুতি এখনও ওর হাতে ধরা।

পাঁচুর নগ্ন শরীরের চারপাশে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল। শুভজিৎ একটা ছেলেকে ডেকে বলল, সোনা, জলদি একটা ট্যাক্সি ডেকে আন্। এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

পাড়ায় একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বসেন, একজন দৌড়ে গিয়ে তাঁকে

ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার এসে পাঁচুর নাড়ী ধরলেন, পাঁচুর স্ত্রী পাংশু মুখে গলির মধ্যে স্বামীর পাশে বসে পড়ল, সবারই মুখ শুকনো, এমন কি, বুদ্ধ পর্যন্ত মারের ভয় ভুলে এক লাফে সকলের মধ্যে এসে দাঁড়াল। মানিক তার হাতে ধরা ধুতিটা দিয়ে পাঁচুর শরীরটা ঢেকে দিল।

ট্যাক্সি উপস্থিত হলে শুভজিৎ মানিককে বলল, 'আপনি হাসপাতালের ঝঞ্ঝাট একলা সামলাতে পারবেন ? না, আমি আসব ?'

মানিক ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে বলল, 'সোনা আর অসীমকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। তুমি সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে এসেছ। বাড়ি গিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করো, তারপর এসো।'

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

হাসপাতাল থেকে বেরুতে দুটো বেজে গেল শুভজিতের ! বোঝা গেল, পাঁচুকে দিন কয়েক হাসপাতালের ভাত খেতে হবে। তবে চোটটা যত মারাত্মক হতে পারত, তা হয়নি। বাঁ হাতের একটা হাড়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে। মাথা আর মুখের চোট অনেক বেশি মারাত্মক হতে পারত, কিন্তু কিভাবে যে বেঁচে গেছে, কে জানে।

মানিক শুভজিৎকে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি বুদ্ধের কুষ্ঠি তো ভাল করে জানি, ওর ওপর যে মন্দ ব্যবহার করবে, সেই বিপদে পড়বে। একেবারে হাতে হাতে ফলে গেল। আমি পাঁচুকে অনেকদিন সাবধান করেছি কিন্তু কে কার কথা শোনে এখন কত দিন ভুগবে, কে জানে।

শুভজিৎ বলল, না 'না খুব বেশি ভোগান্তি নেই। পাঁচুদাকে ওরা দু চার দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। হয়তো বাঁ হাতটায় কিছুদিন প্লাস্টার থাকবে। আপনার চিন্তা নেই, ক'দিনের মধ্যেই উনি আবার লাফিয়ে বেড়াবেন।' বলে মুখ নিচু করে, হাসল শুভজিৎ। এতক্ষণ বাদে মানিকের মুখেও হাসি ফুটল।

শুভজিৎ বলল, 'আমি এবার যাই। একমাস এখানে ছিলাম না, এবার ছাত্রদের আবার ডাকাডাকি করে ফিরিয়ে আনতে হবে। আবার দোকান সাজিয়ে বসতে হবে তো !'

মানিক শুধু বলল, 'হ্যাঁ, এসো।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কমলিকাদের অফিসে গেল শুভজিৎ। ওদের অফিস বাড়ির পরিবর্তন দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেল শুভজিৎ। কমলিকা

ওকে দেখে বলল, 'আসুন, আসুন, হঠাৎ চলে গেলেন, একটা খবর দিয়ে যেতে হয়তো ?'

শুভজিৎ মাথা নিচু করে' অপরাধটা স্বীকার করল, তারপর বলল, 'হঠাৎ যাওয়া ঠিক হল, খবর দেবার আর সময় পেলাম না।'

কমলিকা জিগ্যেস করল, 'মিঠুকে নিয়ে কবে আসবো আবার ?'

শুভজিৎ বলল, 'আজ সকালে এসে পেঁছিছি। ট্রেনের ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আজ বাড়ি ফিরেই লম্বা হবো। কাল চলে' আসুন। অনেকদিন মিঠুকে দেখিনি।'

কমলিকা জিগ্যেস করল, 'মিঠুকে আপনার মনে ছিল ?'

শুভজিৎ একটু হাসল, তারপর অন্য দিকে চেয়ে বলল, 'মিঠুকেও মনে ছিল, মিঠুর মাকে ও।'

কমলিকার গাল দুটি একটু লাল হল, সে কোনো উত্তর করল না।

কমলিকার লজ্জা ঢাকতে শুভজিৎ বলে উঠল, 'আপনাদের অফিসের ভোল একেবারে পাল্‌টে ফেলেছেন দেখছি। কিউবিক্‌ল্‌ মধ্যে আপনাকে দেখে এবার অফিসার অফিসার বলে মনে হচ্ছে। আপনার চিঠি পত্র টাইপ করবার জন্যে একজন টাইপিষ্ট দরকার থাকে তো বলুন, আমি লেগে পড়তে রাজি আছি।'

কমলিকা লজ্জিত মুখে বলল, 'গত দু-এক মাসে আমরা মধ্যযুগ থেকে একেবারে আধুনিক যুগে চলে এসেছি। বাইরে থেকে দেখতে ভালই লাগছে, কিন্তু আমার কাজ অনেক বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু ফাইল বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাই, রাত জেগে কাজ শেষ করি।'

অদূরে কাকাবাবুর ঘর থেকে হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কমলিকা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল। কাকাবাবু উত্তেজিত ভাবে পীযূষের সংগে কথা বলছেন। দূর থেকে মনে হল, কোনো ব্যাপারে পীযূষের সংগে ওঁর মতবিরোধ হয়েছে এবং মতবিরোধ একেবারে চরমে উঠেছে, হঠাৎ কমলিকাকে 'ইনটার-কম' মারফৎ ডেকে পাঠালেন কাকাবাবু।

অনুকূলকে ডেকে শুভজিতের জন্যে চা ফরমাস করল কমলিকা, তারপর বলল, 'আপনি চা খান, আমি এখুনি ফিরে আসছি।' বলে কাকাবাবুর উদ্দেশ্যে দ্রুত বেরিয়ে গেল কমলিকা।

অনুকুল চা নিয়ে এল, এবং ওর পিছন পিছন এল গৌতম। জিগ্যেস

করল, 'কেমন আছেন ?' শুভজিৎ উত্তর করল, 'মাসখানেক এখানে ছিলাম না, আপনাদের দেখছি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।'

গৌতম জিগ্যেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

শুভজিৎ উত্তর করল, 'পশ্চিমে।'

গৌতম আবার প্রশ্ন করল, 'পশ্চিমে, কোথায় ?'

শুভজিৎ বলল, 'কাশী।'

গৌতম বলল, 'কাশীতে আপনাদের কেউ আছেন না কি ?'

শুভজিৎ বলল, 'আমার গুরুদেব কাশীতে থাকেন। বয়েস হয়ে গেছে, কবে কী হয় বলা যায় না, তাই আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসি।'

গৌতম জিগ্যেস করল, 'কত বয়স হয়েছে ওঁর ?'

শুভজিৎ বলল, 'সত্তর পেরিয়ে গেছে। স্বাস্থ্য যদিও বেশ ভালই আছে, কিন্তু বয়সটাইতো একটা রোগ। তাছাড়া ওখানে গেলে আমার মনটা ভাল থাকে। সত্যিকথা বলতে কী, আমরা এখানে সারা দিন টাকার পেছনে দৌড়ে মরছি, শুধু সংসারের সুখ-দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। ওখানে গেলে অনেক আধ্যাত্মিক কথা বার্তা হয়, সংসারটাকে কিছুদিন ভুলে থাকা যায়।'

আধ্যাত্মিক কথাবার্তার সংগে গৌতমের কোনো সম্পর্ক নেই। কী আর বলবে ? ওর কথাতে শুধু মাথা নাড়ল গৌতম।

ওদিকে কাকাবাবুর ঘরে পীযূষ এবং কাকাবাবুর তর্ক উদ্দাম হয়ে উঠল। কাকাবাবু বলছিলেন, তিরিশ হাজার টাকার কাজ, মোটে দু হাজার টাকা দিয়ে গেছে। বাকি আটাশ হাজার কবে দেবে, ঠিক নেই। তুমি মাল ডেলিভারি দিলে কোন্ আক্কেলে ?'

পীযূষও গরম হয়ে উত্তর করল, 'ওরা আমাদের বড়ো খদ্দেরদের একজন, মাল আটকে রাখলে ওরা আমাদের সংগে ব্যবসা বন্ধ করে' দেবে। তখন আমাদের শ্যামও যাবে, কুলও যাবে।'

কমলিকা সাধারণত পীযূষ এবং কাকাবাবুর তর্কাতর্কির মধ্যে কথা বলতে চায় না। হাজার হোক, সে বাইরের লোক। পীযূষ কাকাবাবুর নিজের ভাইপো। কাকারাবুর মৃত্যুর পর পীযূষ হয় তো ব্যবসার একজন অংশীদার হবে। ওদের কথার মধ্যে কথা বলতে গিয়ে ও হয়তো নিজের বিপদ ডেকে আনবে।

কাকাবাবু আর কিছু বললেন না। চেয়ারের পিছন দিকে হেলান দিয়ে

চোখ বুজে বসে পড়লেন। পীযূষ এবং কমলিকা ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কমলিকা নিজের ঘরে ফিরে এল, দেখল, গৌতম এবং শুভজিৎ গল্পে মশগুল।

'কমলিকা বলল, আমি অনুকূলকে ডাকি, আপনি আর এক কাপ চা খান।'

শুভজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না, আর চা নয়। কাজকর্ম নিয়ে আপনাদের ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, এর মধ্যে আমার বসে থাকা ঠিক নয়।

কমলিকা হেসে বলল, 'ও আমাদের রোজকার ব্যাপার।'

শুভজিৎও হাসল, বলল, 'তা হোক, আমি এখন চলি। আপনি কিন্তু কাল মিঠুকে নিয়ে আসছেন।' গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ আসি ভাই। আবার দেখা হবে।'

শুভজিৎ বেরিয়ে যেতে গৌতম বলল, 'শুভজিৎবাবু বলছিলেন, কাশীতে উনি আধ্যাত্মিক সুখের সন্ধান পেয়েছেন। আমাদের অফিসে তো আধ্যাত্মিক সুখের বিশেষ সুবিধে নেই। তবে এখানে উনি আসা-যাওয়া করছেন কেন?'

কমলিকা গৌতমের গলায় হাত দিয়ে ওকে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে বলল, 'তোমার টেবিলে দু' গ্যালি প্রুফ পড়ে আছে। আজ সাড়ে চারটের মধ্যে যদি শেষ না হয়, কাল থেকে তোমার চাকরি নেই।'

ষোল

শুভজিতের মায়ের মনে বেশ কিছু দিন যাবৎ শান্তি ছিল না। এতদিন অশান্তি ছিল চন্দ্রানীকে ঘিরে, এখন নতুন আশান্তির কারণ হ'ল কমলিকা। চন্দ্রানীর বলতে গেলে ওঁর চোখের উপর বড়ো হয়েছে। ছেলের মনের ভিতরটা বিশেষ বোঝা যায় না, কিন্তু চন্দ্রানীর মনোভাব বুঝতে বিশেষ বুদ্ধির দরকার হত না। মেয়েটা অবশ্য ভালো ছিল, কিন্তু বস্তির মেয়ে যে। 'জাত এক হলেও বস্তির মেয়ে ঘরে আনলে আত্মীয় বন্ধুরা বলবে কি? তবু চন্দ্রানীকে উনি নিজের মতো করে, ভালো বাসতেন।

চন্দ্রানী যে শুভজিতের অতি আকৃষ্ট ছিল একথা তিনি জানতেন। কিন্তু

শুভজিৎকে সে নিজের দিকে কতটা আকর্ষণ করতে পেরেছিল, তা তাঁর জানা ছিল না। তাই চন্দ্রানীর মৃত্যুতে তিনি কিছুদিন সন্ত্রস্ত হ'য়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। চন্দ্রানীর মৃত্যুর সংগে সংগে শুভজিৎ কাশী চলে গিয়েছিল। সে ঘটনাও ওঁকে বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছিল। বড়ো ছেলেকে নিয়ে ওঁকে বিশেষ অশান্তি পেতে হয়নি। সে যতটুকু লেখাপড়া করবার করেছে, তারপর একটা চাকরি জোগাড় করে' নিয়েছে। বাইরের মেয়েদের সংগে বিশেষ মেলা-মেশা করেনি। বাড়ি থেকে সম্বন্ধ করে' বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ে করতে কোনো আপত্তিও করেনি। কিন্তু ছোট ছেলেকে উনি মনে মনে ভয় করেন, মুস্কিল হচ্ছে, ওকে সবসময় বোঝা যায় না। শুভজিৎ যখন কাশী থেকে ফিরে এল, ওর মুখ দেখে উনি কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন। মনে হয়েছিল চন্দ্রানীকে বোধহয় ও ভুলতে পেরেছে। কিন্তু কমলিকাকে নিয়ে ওঁর আশান্তির শেষ নেই। বুড়ো মাগী, অতবড় একটা ছেলের মা, ছেলের মাষ্টারের দিকে তোর চোখ কেন? শুভজিৎ যে কমলিকাকে পছন্দ করে, তাও ওঁর অজানা নেই। কমলিকার বিধুদ্ধে মায়ের মন সশস্ত্র হয়ে' উঠল, উনি শুভজিতের বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় শুভজিৎ একটি ছাত্রকে সেতারের লেস্‌ন্‌ দিচ্ছিল, উনি তখন গলি দিয়ে বেরিয়ে পাশের বাড়িতে মানিকের ঘরে গেলেন। মানিক বাইরের ঘরে বসে' কারো কোষ্ঠীর ছক পরীক্ষা করছিল। মা একবার প্রীতির কাছে গেলেন, কী রান্না হচ্ছে খবর নিলেন, একবার বুদ্ধের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন, তারপর বাইরের ঘরে মানিকের কাছে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

মানিককের সংগে শুভজিৎদের কোনা রক্তের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু মানিক ওদের আত্মীয়ের অধিক ছিল। ছেলে বেলায়, স্কুলে পড়বার সময়, যখনই রণজিৎ বা শুভজিতের অংক বুঝে নেবার দরকার হয়েছে, তখনই ওরা মানিকের কাছে গেছে। মানিক শুভজিতের বাবাকে কাকা বলে' ডাকত। শুভজিতের মাকে টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসতে দেখে মানিক একটু অবাক হল, তারপর ছক থেকে মুখ তুলে বলল, 'কী ব্যাপার?'

মা জিগ্যেস করলেন, 'পাঁচুর খবর কি?'

মানিক উত্তর করল, পাঁচুকে কালই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। ভালই আছে। বাঁহাতটা একটু জখম হয়েছে, বোধহয় মাসখানেক প্লাষ্টার থাকবে।'

পাঁচুর শরীর সম্পর্কে মায়ের বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, আসল কথা পাড়বার আগে ভনিতা হিসেবে তিনি পাঁচুর উল্লেখ করেছিলেন।

মায়ের ভনিতা তখনও শেষ হয়নি, বললেন, 'বুদ্ধ কেমন আছে আজকাল ?'

মানিকের মুখ একবার বিকৃত হল, তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ও আর কবে মন্দ থাকে ? সবই তো আপনারা জানেন। যত ঝঞ্ঝাট, সর্বতো আমাদের।'

মা বললেন, 'তবু ওর সম্পর্কে একটা কিছু ব্যবস্থা তো তোমাকে করতে হবে !'

মানিক একবার হাতের কোষ্ঠিটার দিকে চেয়ে দেখল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'কী ব্যবস্থা করব, বলুন ? পৈতৃক ভিটেটা রয়েছে, ব্যাঙ্কে সামান্য কিছু রেখে যাবার চেষ্টা করব, কিন্তু তাতে কতটা কাজ হবে জানিনা। বুদ্ধ বাড়িও বোঝে না, টাকাও বোঝে না। আমরা মরলে ওর কি হবে, জানি না।'

মা বললেন, 'আজকাল নানা রকম মিশন-টিশন হয়েছে, হয়তো তাদের কারো কাছে ওকে রাখবার ব্যবস্থা করা যায়।'

মানিক বলল, 'আমি খোঁজ খবর করছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই ভাগ্য। বুদ্ধের কুষ্ঠি যদিও ভালো, কিন্তু আমরা তো ভবিষ্যৎটা ছবির মতো চোখের ওপর দেখতে পাই না, তাই চিন্তা হয়।'

কোষ্ঠির উপর মায়ের কোনোখানেই আস্থা নেই। উনি বলেলন, 'ওসব কুষ্ঠি টুষ্ঠি ছাড়ো। তোমাদের অবর্তমানে ছেলেটা যেন দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়, তার ব্যবস্থা করো।'

মানিক হাসল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, আমি সব রকম খোঁজ খবর করছি। দেখি, কী হয়।'

মা এবার আসল কথায় এলেন, 'তোমরা এবার সুবুটার একটা ব্যবস্থা করে' দাও।'

সুবু অর্থাৎ শুভজিৎ। মানিক ভুরু তুলে বলল, 'শুভজিতের কী হয়েছে ?'

মা বললেন, 'কিছু হয় নি। ছেলে বড়ো হয়েছে, এখন বিয়ে থা দিতে হবে না ?'

মানিক বলল, 'তা বটে। তবে কি জানেন, আজকালকার ছেলে, আমরা কি আর আগেকার যুগের মতো ওদের ধরে করে বিয়ে দিতে পারবো? ও হয়তো নিজেই কোথাও বিয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছে।'

মা দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করলেন, 'না, তা হবে না। কোত্থেকে কাকে ধরে' ঘরে নিয়ে আসবে, সে আমার পোষাবে না।'

শুভজিতের মায়ের মনের দৃঢ়তায় মানিক মনে মনে হাসল, একটু বিরক্তও হল, বলল, 'আপনার আমার পোষালো কি না পোষালো তাতে কী এসে যায়, যে বিয়ে করবে তার পোষালেই হল। কাকিমা, যুগটা বদলে গেছে, সেটা ভুলবেন না।'

মানিকের কাকিমা মানিকের মতো যুগের পরিবর্ত্তনের কথা মনের মধ্যে গ্রহণ করতে রাজি নন, তিনি বললেন, 'না, না, তা হবে না, তুমি স্কুলে পড়াও, তোমার অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে, তাদের মধ্যে থেকে একটা খুঁজে দাও।'

মানিক বলল, 'শুভর কুষ্ঠি আমার কাছে আছে। আমি একবার দেখবো, ওর বিয়ের সময় হয়েছে কিনা।'

শুভজিতের মায়ের ভাগ্য থেকে পুরুষকারে বিশ্বাস অনেক বেশি। তিনি বললেন, 'কুষ্ঠি দেখে ছাই হবে। তুমি মেয়ে জোগাড় করো। তারপর যা করবার আমি করবো।'

নিজের ক্ষমতার উপর শুভজিতের মায়ের অসীম আস্থা। মানিক আর কথা বাড়াল না, বলল, 'ঠিক আছে, আমি পাত্রীর সন্ধান করছি।'

মা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি কাল থেকেই লেগে যাও। আমি তোমাকে মাঝে মাঝে এসে তাড়া লাগাবো।'

মানিক বলল, 'আচ্ছা।'

রাত দশটায় বাড়ি ফিরে খেতে বসে শুভজিৎ বলল, 'বৌদির শরীর আজ কেমন?'

মা গম্ভীর মুখে উত্তর করলেন, 'কেমন আর? এসময় যেমন থাকবার, তেমনই আছে।'

শুভজিৎ বলল, 'ভুতু কোথায়?'

মা বললেন, 'রাত দশটা বেজে গেছে। তোদের তো কিছুতেই খাবার সময় হয় না। ভুতু কি এতক্ষণ জেগে থাকে?'

শুভজিৎ আর কী বলবে ? সে তরকারি দিয়ে ভাত মাখতে লাগল। মা বললেন, 'আমি সন্ধ্যেবেলায় মানিকের বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

শুভজিৎ এক গ্রাস মুখে পুরে' জিগ্যেস করল, 'কেন ?'

মা বললেন, 'ওকে মেয়ে দেখতে বললাম।'

শুভজিৎ বলল, 'মেয়ে দিয়ে কী হবে ?'

মায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হল, বললেন, 'আমার মাথা আর মুণ্ডু হবে।'

শুভজিৎ বলল, 'সেদিন তো তোমাকে বললুম, বিয়ে হ'লে বৌকে শুতে দেব কোথায় ? আমি তো বাইরের ঘরে হয় সতরঞ্চির উপর, অথবা ক্যাম্প খাট পেতে শুয়ে থাকি। বৌ-এর জন্যে আর একটা সতরঞ্চি বা ক্যাম্প খাট কিনবো নাকি ?'

মা বললেন, 'বাজে বকিস্ নি। একতলার পেছনের ঘরটা এক গাদা বাজে জিনিসপত্তরে বোঝাই হয়ে আছে। ও ঘরটা ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে নিলেই হবে।'

শুভজিৎ হাসল, 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই। তা, শোবার ব্যবস্থা তো হল, বৌকে খাওয়াবো কী ?'

মা বললেন, 'মাস গেলে বাঁধা মাইনে তোর নেই বটে, কিন্তু রণুর থেকে তোর রোজগার তো কম হয় না। সবার জুটছে, বৌ এলে সেও দুবেলা দুমুঠো পাবে।'

শুভজিৎ বলল, 'দুবেলা দুমুঠোর যুগ অনেকদিন আগে শেষ হয়ে গেছে। আজকাল মানুষের চাহিদাও বেড়ে গেছে, খরচাও বেড়ে গেছে।'

মা মুখটা বিকৃত করে বললেন, 'তুই এবার একটা চাকরি জুটিয়ে নে, সুবু। এভাবে আর কতদিন কাটাবি ?'

শুভজিৎ হাসল, 'চাকরি কী আমার মায়ের হাতের মোয়া, যে হ্যাঁ করলেই টুপ করে আমার মুখের মধ্যে এসে পড়বে ?' মায়ের বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। উনি কী যেন বলতে গেলেন, শুভজিৎ হাত তুলে ওঁকে থামিয়ে ছিল, একটা মাছ ভেঙে কিছুটা নিজের মুখে পুরল, কিছুটা জোর করে' মায়ের মুখে গুঁজে দিল বিধবা, নিরামিষ খেতে কষ্ট হয়, তবু খান। এ নিয়ে প্রথম প্রথম শুভজিৎ খুব গোলমাল করত, জোর করে মাঝে মাঝে মায়ের নিয়ম ভঙ্গ করে দিত। মাকে চুপ করাবার জন্যে আজও

তাই করল। উনি আর কিছু বললেন না, মুখ নিচু করে মেজের দিকে চেয়ে রইলেন, চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

কমলিকা ক'দিন আসেনি। শুভজিৎ মনে মনে ছটফট করল কটা দিন, তারপর একদিন শনিবারের বিকেলে ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। সেখানে গিয়েও নিরাশ হতে হল ওকে, কারণ কমলিকা তখনও অফিস থেকে ফেরে নি। রুদ্রপ্রসাদ জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কে ? কী দরকার এখানে ?' বৃদ্ধের প্রশ্নের ধরনে মনে বনে একটু বিরক্ত হল শুভজিৎ, তারপর আসবার কারণ জানাল। রুদ্রপ্রসাদ বললেন, 'তুমি অন্য সময় এসো। এখন আমার চা খাবার সময়।'

শুভজিত বুঝল, রুদ্রপ্রসাদ যথেষ্ট প্রকৃতিস্থ নন। সে চলে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় মণির মা বাইরের ঘরে এলেন। শুভজিতের পরিচয় নিয়ে বুঝলেন, সে কে। বললেন, বৌমা তো এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। অফিসে এখন ভীষণ কাজের চাপ, আমরা কদিন বাদে আসানসোল চলে যাচ্ছি। যাবার আগে অফিসের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে তো !'

'কমলিকা তা হলে স্বামীর কাছে চলে যাচ্ছে !' শুভজিতের বুকের ভিতর কি যেন আঁচড়াতে লাগল। মনকে বোঝাতে চাইল, কমলিকা স্বামীর কাছে চলে যাবে, তাই তো স্বাভাবিক। তবু বারবার মনে হতে লাগল, 'কমলিকা আমাকে বলল না কেন ?' মনে হল, কমলিকা যেন ওকে লুকিয়ে চলে যাচ্ছে। বারবার মনে হতে লাগল, 'ঠকে গেলাম, আমি ঠকে গেলাম।'

দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে বাইরের ঘরে ছুটে এল মিঠু। প্রায় ওর কোলে চেপে বসল। তারপর বলল, 'শুভদা, আমরা আসানসোল চলে যাচ্ছি।'

শুভজিৎ জিগ্যেস করল, 'কবে ?'

মিঠুর ঠাকুমা মিঠুর হয়ে উত্তর দিলেন, 'তা তো ঠিক জানি না, বাবা। বোধহয় পনেরো বিশ দিনের মধ্যে। মণি বাড়ি ঘর দোর ঠিক করে ফেলেছে। সামনের শনিবার সে আসবে। জিনিস পত্তর গুছিয়ে রেখে যাবে। তারপর বৌমার কাজ কর্ম চুকে গেলে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে একদিন বেরিয়ে পড়ব।

শুভজিতের মনের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। ওর মনের মধ্যে গত কয়েকমাস ধরে যে বস্তুটি তিল তিল করে' গড়ে উঠেছিল, সেটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। চন্দ্রানী চিরকালের মতো ছেড়ে চলে গেছে, তাকে আর

ফিরে পাওয়া যাবে না। বাবলুও বোধহয় ওর জীবন থেকে হারিয়ে গেল, দুর্গাপুরে গিয়ে আর ফিরলো না। কাকার বাড়িতে বসে' আছে কেন, কে জানে? কমলিকার সংগে ওর মধুর এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বাইরে থেকে তার প্রকাশ কম, সম্পর্কটা মূলতঃ অন্তঃসলিল। তাই এতদিন মনে হয়েছে ওর। আজ, ওর মনে দ্বিধা জাগল। মনে হল, ও নিজে মনে মনে একটা স্বপ্নের জগতে বিচরণ করেছে, বালুকারাশির উপর ইমারত গড়েছে। কমলিকাকে যা নয় তাই ভেবেছে। কমলিকার মন হয়তো ওর প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, ও নিজেই বুঝতে ভুল করেছে। 'অপমানে ওর মুখ কালো হয়ে উঠল। নিজেকে ওর নির্বোধ এবং প্রবঞ্চিত বলে' মনে হ'তে লাগল।

শুভজিৎ মিঠুর দিকে ফিরে জিগ্যেস করল। 'তুমি আর সেতার শিখবে না?' মণির মা শুভজিতের মনের ভিতরের কথা কিছুই জানেন না। নইলে তাঁর ঠিক মনে হত, শুভজিতের প্রশ্ন নিতান্তই অর্থহীন। ওর মনের কান্না যা হোক একটা প্রশ্নের আকারে বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে।

মিঠুর কণ্ঠেও বিষাদের সুর। সে বলল, 'নাঃ আর আমি সেতার শিখবো না। আসানসোলে গিয়ে বাবার সংগে ফুটবল খেলবো।'

শুভজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আজ আসি।'

মণির মা বললেন, 'বোসো, তোমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দিই।

শুভজিৎ মিঠুর হাতে একটু চাপ দিল। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আজ থাক। আর একদিন এসে চা খাবো।' মনে মনে বলল, 'তাসের ঘর ভেঙে গেছে। আর কোনোদিনই আসব না। কমলিকা কেন আমাকে বলল না? কমলিকা কেন আমার সংগে মিথ্যাচরণ করল।' শুভজিৎ ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে বাইরে পথের উপর এসে দাঁড়াল।

পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বলতে লাগল, মিথ্যে, সব মিথ্যে। চন্দ্রানী মিছে কথা বলেছে। কমলিকাও মিছে কথা বলেছে। আমি বোকা। তাই, সবাই আমাকে ঠকিয়েছে। সারাদিন পথে পথে ঘুরে রাত্রির অন্ধকারে ও ঘরে ফিরে এল। এসে' বাইরের ঘরে সতরঞ্চিটার উপর শুয়ে পড়ল।

ভুতু ঘরে এসে দেখল, কাকা সতরঞ্চির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে।

সে জিগ্যেস করল, 'কাকা, ভাত খাবে না?'

'না', উত্তর করল শুভজিৎ।

'কেন ?'

'কি বললি ?' শুভজিৎ অন্যমনস্ক।

'ভাত খাবেনা কেন ?'

'খিদে নেই।'

'কেন ?'

'বিরক্ত করিস্ নি ভুতু !'

ভুতু চলে গেল। শুভজিৎ বালিসটা টেনে নিল, বুকের নিচে বালিস রেখে উপুড় হয়ে শুল।

ঠাকুমার ফরমাসে ভুতুকে আবার আসতে হল বাইরের ঘরে। ও বুঝেছিল, কাকার মন ভালো নেই। যদি মন্ত্রবলে ও কাকার মনের কষ্টটা দূর করে দিতে পারত, ভুতু ভাবল। কাকার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। যদি মন্ত্রবলে কাকার পেটটা ভরিয়ে দিতে পারত !

কিন্তু, ভুতুর এসব অতি লৌকিক ক্ষমতা নেই। শুভজিতের মনের কষ্টও দূর হল না, পেটও ভরল না। একটু বাদে ও এসে শুভজিতের পাশে বসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। শুভজিৎ কিছু বলল না।

ভুতু বলে উঠল, 'কাকা, রূপকথা শুনবে ?'

"রাজার মনে দুঃখ বেজায়, হারিয়ে গেছে রাণী।
কাঁদছে রাজার পরান খুড়ো, রুদ্ধ মুখের বাণী।"

শুভজিৎ পাশ ফিরে শুয়ে বলল, 'চুপ কর তো !'

দিন পনেরো আগে 'ছড়ার রূপকথা' বইটা ভুতুকে কিনে দিয়েছিল শুভজিৎ। বিদ্যে জাহির করবার এমন সুযোগ সব সময় আসে না। শুভজিতের নিষেধে কর্ণপাত না করে ভুতু বলে চলল ঃ

"রাণীর শোকে বেরিয়ে রাজা চলল সাগর পার,
আনলো জিতে দৈত্যপুরীর রত্নমণির হার।"

শুভজিতের কণ্ঠস্বর এবার তীক্ষ্ন হল, বলল, 'মার খাবি ?'

ভুতু উঠে গেল। রাত এগারোটার সময় মা এসে ডাকাডাকি করতে উঠে পড়ল শুভজিৎ, সামান্য দুটি খেয়ে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল সতরঞ্চির উপর।

জানলা দিয়ে সূর্যের আলো চোখে পড়তে ঘুম ভাঙল শুভজিতের।

সকাল হয়ে' গেছে। মেজাজটাত খিঁচড়ে আছেই, মাথাটাও ধরে' আছে। এমন সময়, রাণা এল সেতারের লেস্‌ন্‌ নিতে। শুভজিৎ মুখ হাত ধুয়ে বসে' গেল রাণার সামনে। মিঠু আর আসবে না, মনে পড়ল শুভজিতের। হাসি ঠাট্টা করে' শুভজিতের ক্লাস ঘরে প্রাণের জোয়ার বইয়ে দেয় বাবলু, সে আর আসবে না। সেতারের সংগে আজ আর তবলা বাজবে না। চন্দ্রানী চলে গেছে, আজ আর তানপুরাও বাজবে না। সুরটাই কেটে গেছে। কমলিকা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না ওর জীবনে।

রাণার বাজনাতে একবার সুর কেটে গেল। শুভজিৎ চিৎকার করে' উঠল, 'এক মাস ছিলাম না। এর মধ্যেই সব ভুলে গেছিস্‌? এই সব অপদার্থের দলকে বাজনা শেখানো পণ্ডশ্রম মাত্র।'

রাণার চোখ মুখ শুকিয়ে গেল। একটা অদৃশ্য বেত যেন ওর চোখের সামনে নাচতে লাগল। ও আর সেতারে সুরারোপ করতে পারল না। শুভজিৎ কঠিন স্বরে বলল, 'আজ বাড়ি যা। মাকে বলবি, মাইনে পাঠিয়ে দিতে। আমি লঙ্গরখানা খুলে বসি' নি। মাগ্‌না শেখাতে পারবো না।'

রাণা চোখের জল চেপে সেতার হাতে উঠে গেল। ভুতু কী একটা বলতে গিয়ে ধমক খেল। মা এসে ওকে পায়ে চটি গলাতে দেখে বললেন, 'বেরুছিস্‌? জল খাবার খেয়ে যা।'

শুভজিৎ মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। এক দৌড়ে চলে এল বাবলুদের বাড়িতে। বাইরের ঘরে মিসেস চক্রবর্তীর সংগে দেখা। উনি শুভজিৎকে বললেন, 'বাবলু কাল দুর্গাপুর থেকে ফিরেছে। তুমি ভেতরে যাও, ও ঘরেই আছে।'

ভিতরে গিয়ে শুভজিৎ দেখল, বাবলু তখনও শুয়ে। সাড়ে নটা বেজে গেছে! এখনও শুয়ে রয়েছে বাবলু? পাশ ফিরে শুয়ে ছিল বাবলু। পায়ের আওয়াজে। মুখ ফেরাল। তারপর দৃষ্টিহীন চোখে শুভজিতের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

শুভজিৎ একটা চেয়ার টেনে বসল, বলল, 'তুই ফিরে এসেছিস্‌? আমাকে একটা খবর দিবি তো!'

বাবলু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে' চেয়েই রইল শুভজিতের দিকে। শুভজিৎ বিস্মিত হয়ে' জিগ্যেস করল, 'তুই ঠিক আছিস তো?'

বাবলু যেন এতক্ষণে চেতনা ফিরে পেল। ধড়মড় করে উঠে বসল,

তারপর শুভজিতের প্রশ্নের উত্তরে বলল, শুভদা, আমি দুর্গাপুরে চাকরি পেয়েছি। দু দিনের ছুটিতে এসেছি। দু চার দিনের মধ্যেই আমি আবার চলে যাব।'

শুভজিতের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এতো খুব আনন্দের কথা রে!'

বাবলু বিছানা ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে তোমার আশীর্বাদ নিয়ে যেতে চাই।' শুভজিতের মনে পড়ল, চন্দ্রানী ওর আশীর্বাদের পরোয়া না করে' চলে' গেছে। শুভজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে ম্লান হেসে বলল, 'তুই ব্রাহ্মণ, আমার আশীর্বাদ তোর ওপর খাটবে কেন? তোর জন্যে আমার সব শুভেচ্ছা রইল।' মনে মনে ভাবল, শুভেচ্ছা জানানোর মতো একজন মানুষও আর রইল না তার।

বাবলু মাথা নিচু করে' ওকে প্রণাম করে' বলল, 'তুমি আমার গুরু। তোমার আশীর্বাদ আমার ওপর ঠিকই খাটবে।' বাবলুর মাথায় হাত রাখল শুভজিৎ।

বাবলু বলল, 'শান্তাপ্রসাদের মতো তবলজি হবো ভেবেছিলাম, কিন্তু কিছু হল না। আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, শুভদা।'

শুভজিৎ বলল, 'না রে না, তুই যা করছিস্, ঠিকই করছিস্। আমারা কেউই ব্যর্থ নই।'

বাবলু এগিয়ে এসে ডান হাতের একটা আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এই দ্যাখো, পলার আঙটি। মানিকদা দিয়েছেন। বলেছিলেন, আঙটি পরলে টাকা পয়সার সমস্যা মিটবে। আঙটিটা ভালো না মন্দ, বুঝতে পারছি না।'

শুভজিৎ হাসল, এগিয়ে এসে একবার দু হাত দিয়ে বাবলুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল, তারপর বলল, 'আমি আজ আসি। যাবার আগে আর একবার দেখা করে যাস্।'

চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে পা বাড়াতে পিছন থেকে বাবলুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল শুভজিৎ। 'শুভদা, তুমি আমাদের থেকে কত বড়ো, তোমাকে কখনও কিছু বলিনি। আজ তোমাকে আমি তিরস্কার করছি। চন্দ্রানীকে তোমরা মরতে দিলে কেন?'

শুভজিৎ এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়াল, তারপর মুখ না ফিরিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বলল, 'আমরা নয়, আমরা নয়, আমি। আমি একলা। আমিই

ওকে মেরে ফেলেছি। আমার ভুল হয়ে গেছে রে, আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে তোরা ক্ষমা করিস্।'

সতেরো

কমলিকাদের বাড়িতে জিনিস পত্র প্যাকিং হচ্ছে। মণি আছে, মণির দুই বন্ধু অরূপ আর রতন আছে, জন দুয়েক কুলিও আছে, সবাই মিলে, অসংখ্য জিনিস পত্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা ফ্যামিলি একটা বাড়িতে বহুকাল ধরে স্থায়ী ভাবে বাস করতে থাকলে কত জিনিস যে জমে যায়, তার ঠিক নেই। সব জিনিস একসংগে চোখের সামনে থাকেও না, তাই সমস্ত জিনিসের মোট পরিমাণ কত, তা সব সময় বোঝাও যায় না।

আয়না সমেত ড্রেসিং টেবিল প্যাক করা হয়ে গেছে। সিন্দুর কৌটো এনে শ্বাশুড়ীর সামনে গিয়ে কমলিকা বলল, 'মা, আমায় সিন্দুর পরিয়ে দিন।' মণির মা কমলিকার সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আয়ষ্মতী হও।' কমলিকাও শ্বাশুড়ীর সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দিল। চটি জোড়া পায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় মণি ওকে ডেকে বলল, 'চাকরিটা একেবারে ছেড়ে দিয়ো না। দুমাসের ছুটি নেবার চেষ্টা কোরো।'

কমলিকা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন ?'

মণি বলল, 'ওখানে সব কেমন চলবে, কিছু বুঝছি না। যদি মনে হয় সুবিধে হচ্ছে না, ফিরে আসবার পথ খোলা থাকবে। বাড়িটাও এখন তালাবন্ধ করে' রেখে যাবো, অরূপরা মাঝে মাঝে খোঁজ খবর করবে। যদি দেখি, আসানসোলে কারো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তখন বাড়িটার যাহোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

কমলিকা চিন্তিত মুখে বলল, 'আচ্ছা, দেখি।'

মণি আবার বলল, 'কাকাবাবু যদি আপত্তি করেন, তাহলে তো চুকে-বুকে গেল। নইলে, লম্বা একটা ছুটির দরখাস্ত দিয়ো।'

কমলিকা 'আচ্ছা' বলে' বেরিয়ে গেল।

বাস থেকে নেমে বীণাবাদিনী প্রকাশন ভবনের দিকে চলেছিল কমলিকা। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি লেগে রয়েছে ওর। মুরারি আর

স্বপন গত মাসে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। মুরারি একটা খবরের কাগজের অফিসে এডিটোরিয়াল বোর্ডে কাজ পেয়েছে। মাইনে বীণাবাদিনীর থেকে অনেক ভালো। কাজটাও অনেক বেশি সম্মানের। এখানে সে মূলতঃ প্রুফরীডিং-এর কাজ করত, এখানে ওখানে লেখালেখিও করতে হয়, কখনও কখনও সম্পাদনার কাজও করতে হয়। এই কাজের যোগ্যতা মুরারির আছে। স্বপন বীণাবাদিনী ছেড়ে পোণ্টগ্রাজুয়েটে যোগদান করেছে। অসময়ে বাবা মারা যেতে আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, এখন অল্প সল্প কিছু জমিয়ে নিয়েছে। টিউশনি করে কোন মতে চালিয়ে নিতে পারবে দুটো বছর। স্বপন-মুরারি গেছে, এবার আমিও চললাম, মনে মনে বলল কমলিকা।

যে জিনিস তিল তিল করে গড়ে তোলা যায়, তাকে ভেঙে ফেলতে সকলেরই মায়া হয়। বীণাবাদিনী'র সংগে ওর সম্পর্ক তো কম দিনের নয়। কত জিনিস একেবারে ওর নিজের হাতে গড়া। সেই সব জিনিসের সংগে একটা নাড়ীর টান এসে গেছে। কমলিকার মনের মধ্যে একটা বিষাদের সুর বাজছিল!

অফিসে ঢুকতে গিয়ে কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হতে লাগল কমলিকার। চারদিকে অস্বাভাবিক নীরবতা। গৌতম এখনও এসে পৌঁছয় নি। পীযুষের সাড়া পাওয়া গেল না। ছাপানোর ঘর থেকেও কোনো আওয়াজ নেই। অফিসের ভিতরে চারদিক যেন থম্ থম্ করছে।

কমলিকা নিজের ডেস্কের সামনে বসে' অভ্যেস মতো ডেকে উঠল, 'অনুকূল!' অনুকূল চা এনে দিলে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে দিনের কাজ আরম্ভ করে কমলিকা। আজ অনুকূলের সাড়া পাওয়া গেল না। হাতঘড়িতে সময় দেখল কমলিকা, দশটা বাজতে এখনো দশ মিনিট বাকি। ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নিশ্চয়ই এখনও ওরা কেউ এসে পৌঁছয় নি। আর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে সকলেই এসে যাবে।

কমলিকা টাইপ মেশিনের সামনে বসে' নিজের রেজিগ্নেশনের চিঠিটা টাইপ করল। মণির পরামর্শ মতো ছুটির দরখাস্ত দিতে ওর ইচ্ছে হল না; আর কোনো পিছুটান রাখতে চায় না কমলিকা। মণি চাকরি করবে আসান-সোলে, আর ও অসুস্থ শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং নাবালক ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাবে, এই সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ

ক'রে ফেলবে ও। ওর চিঠিটা শেষ হ'তে না হ'তে ইন্‌টারকম্-এ কাকাবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। উনি কমলিকাকে ডাকছেন। কাকাবাবুর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে ও একেবারে চমকে উঠল। রেজিগ্‌নেশন লেটারটা কমলিকার হাতে ধরা ছিল, সেটা নিয়ে ও দ্রুতপায়ে কাকাবাবুর ঘরের দিকে গেল। কাকাবাবুর মুখের চেহারা দেখে কমলিকার মনের ভিতরটা কেঁদে উঠল। ওঁর মুখের মধ্যে সব হারানো বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সামনে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, কাকাবাবু?'

কাকাবাবুর চোখ জলের ভারে টল টল করছে; উনি বললেন, 'কমলিকা, আজ আমি সর্বস্বান্ত, পীযূষ আমাকে পথের ভিকিরি করে পালিয়েছে।'

কমলিকার বুকের ভিতরটা চমকে উঠল। স্বপন ঠিক এই কথাই কিছু-দিন আগে বলেছিল। তখন স্বপনের কথাতে গুরুত্ব দেয়নি কমলিকা। তারপর স্বপন কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, স্বপনের সাবধানবাণী ওর মনেও ছিল না। আজ ওর নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হল। কাকাবাবু বলে চললেন।'

'পীযূষ আমার দাদার ছেলে, ও যে এমন করবে, তা আমার স্বপ্নের বাইরে। ও কুদঘাটে গিয়ে নতুন প্রেস খুলেছে।'

কমলিকা প্রশ্ন করল, 'পীযূষবাবু কি কিছু নিয়ে গেছেন?'

ক্যাকাবাবু ম্লান মুখে বললেন, 'কী নেয় নি? সেদিন বড়ো মেসিনটা সারাবার নাম করে, বার করে নিয়ে গেছে। ভুয়ো কোম্পানি খাড়া করে, প্রচুর মাল বার করে নিয়েছে। চেক কেটে ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় সব টাকাই তুলে নিয়ে গেছে। কী আর বলবো বলো? ঘর শত্রু বিভীষণ!'

কমলিকার মুখ থেকে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা বিরাট দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ও এখন কী করবে? কাকাবাবুর যা মনের অবস্থা, এখন কীভাবে ও রেজিগ্‌নেশন লেটার কাকাবাবুর হাতে দেবে? কী যে করবে, কমলিকা ভেবে পেল না।'

দীর্ঘ নিঃশ্বাসের আওয়াজ কানে যেতে কাকাবাবু মুখ তুলে চাইলেন। কমলিকার মুখে বেদনার চিহ্ন দেখে' উনি ভুল বুঝলেন। ভাবলেন, কমলিকা চাকরি চলে যাবার ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। উনি উঠে দাঁড়িয়ে কমলিকার হাত দুটো ধরে' বলে উঠলেন, 'কমল, তুমি আমার মেয়ের মতো। এ সময় তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। এখনও যা আছে, তা দিয়ে আমি আবার

নতুন করে' গড়ে তুলতে পারবো। তুমি ম্যানেজার হও। অন্ততঃ যতদিন না আমার নাতি বড়ো হয়ে ওঠে।'

কমলিকা কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না; কিছু বলবার সুযোগই পাওয়া গেল না। রেজিগ্‌নেশনের চিঠিটা হাতেই ধরা রইল। আস্তে আস্তে ও নিজের জায়গায় ফিরে এল।

অনেক খোঁজাখুজির পর পুরনো পরিচিত বিকাশ রুদ্রের বাড়ি খুঁজে বার করল শুভজিৎ। দশ বছর আগে বিকাশের সংগে ভাল রকম জানাশোনা ছিল। বিকাশ তবলজি। বাজারে নামডাক আছে। অল্প কিছুদিন আগে বাড়ি বদল করেছে। একলা মানুষ, তবলা শিখিয়ে মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছে।

বিকাশ এক মিনিট শুভজিতের মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, 'শুভজিৎ না? মাঝে মাঝে তোমার নাম শুনতে পাই, তা আমার কাছে কী মনে করে? বোসো, এককাপ চা খাও। তোমার শরীর ভালো তো? বিয়ে করলে কবে? আমাদের একেবারে ভুলে গেলে ভাই!'

বিকাশের এতগুলি প্রশ্নের উত্তর একসংগে দেওয়া শুভজিতের সাধ্য ছিল না। সে একটা চেয়ার টেনে বসে' বলল, 'সব বলছি, রোদে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে' পড়েছি। আগে এক গ্লাস জল খাওয়াও।'

এটা ওটা দু'চারটে কথার পর শুভজিৎ কাজের কথা পাড়ল, বলল, 'আমি সেতার বাজাই, তাতো জানোই। এই আমার পেশা, তোমার যেমন তবলা। আমার তবলজি দূর দেশে চলে গেছে, ভালো একজন তবলজি দরকার আমার। তোমার কাছে সেই জন্যে এসেছি।'

বিকাশ খুব খুশি, যারা ছাত্র, তাদের যদি জীবনে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারা যায়, শিক্ষকের কাছে তার থেকে বড়ো সার্থকতা আর কিছু নেই। শুভজিৎ বিকাশের এক ছাত্রের বাজনা শুনল কিছুক্ষণ, তারপর আগাম মাইনে দিয়ে বিকাশকে বলল, 'ওকে আজ বিকেলেই পাঠিয়ে দিয়ো, তবলার অভাবে আমি কিছুদিন যাবৎ ভালভাবে সেতার বাজাতে পারছি না।'

বাড়ি ফিরে দেখে গলির মোড়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, ট্যাক্সির সামনে টুলু, শুভজিৎকে আসতে দেখে এগিয়ে এল ওর দিকে। ওর বুকটা ধড়ফড় করে' উঠল। টুলুকে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার?'

টুলু বলল, 'বৌদিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এখুনি।'

শুভজিৎ জিগ্যেস করল, 'কোন্ বৌদি ? আমার বৌদি ? ভুতুর মা ?'

টুলু ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

শুভজিৎ পা চালিয়ে বাড়ির ভিতরে গেল। দাদা যথারীতি অফিসে। বাড়ির সকলে হাসপাতালে যাবার জন্যে প্রস্তুত। মা বললেন, 'সুবু এসেছিস্ ? বৌমাকে নিয়ে এখুনি সেবাসদনে যেতে হবে। ভুতু সারাদিন সবসময় সকলের ওপর সর্দারি করে বেড়ায়।' শুভজিৎ দেখল, আজ ওর মুখে কথা নেই, বারান্দার এককোণে শুকনো মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শুভজিৎ মায়ের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'দাদাকে একটা খবর দিতে হবে তো।'

মা বললেন, 'আগে সেবাসদনে যাই, ওখান থেকে রনুকে একটা ফোন করে দিস্। বাড়িতে টেলিফোন থাকলে কত সুবিধা হয়, বল দেখি !'

শুভজিৎ হেসে বলল, তাতো হয়, কিন্তু বাবা বেঁচে থাকতে টেলিফোনের দরখাস্ত করা হয়েছিল, এখনও পাওয়া যায় নি। কী করবো, বলো ?'

সেবাসদনে পেঁছে বৌদিকে একটা কেবিনে ভর্তি করা হল। মা বৌদির কাছাকাছি রইলেন। সেবাসদনের উল্টো দিকে একটা সিঙ্গাড়া কচুরির দোকান আছে। দাদাকে টেলিফোন করে ভুতু আর টুলুকে নিয়ে সেই দোকানে ঢুকল শুভজিৎ। বেলা দু'টো বেজে গেছে, পেটে দানাপানি পড়েনি। কিছু কচুরি জিলিপি খেয়ে পিত্তি রক্ষা করতে হল।

আধঘণ্টার মধ্যে অফিস থেকে এসে হাজির হল রণজিৎ। চারজনে কেবিনের বাহিরে দাঁড়িয়ে, দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল। ভিতর থেকে বৌদির কাতরানি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ তীব্র একটা চিৎকার তারপর বৌদির স্বর ক্রমশঃ নিম্নতর গ্রামে নেমে এল। রণজিৎ জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে শুভজিতের শুকনো মুখের দিকে চেয়ে দেখল। একটু দূরে ছোট একটা টুলে ভুতুকে নিয়ে বসে পড়ল টুলু। এমন সময় কেবিনের ভিতর থেকে মায়ের মুখটা বেরিয়ে এল। মায়ের মুখে হাসি। প্রায় চিৎকার করে মা বললেন, 'ছেলে হয়েছে। রণু, হরির লুটের ব্যবস্থা কর। আমি সবাইকে বলেছি, ছেলে হলে হরির লুট দেব।

শুভজিৎ দাদার মুখের দিকে চেয়ে হাসল। তারপর ভুতুকে দুহাতে

কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'ভুতু, তোর ভাই হয়েছে রে। এতদিন আমাদের ওপর সর্দারি করেছিস্, এবার আসল জায়গায় সর্দারি করবি।

রণজিৎ ভাইয়ের কথা শুনে হাসল, ভাই হওয়ার গুরুত্ব কতখানি, ভুতু তা জানে না। সে চুপ করে কাকার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যেবেলায় বিকাশের ছাত্র সুরেশ এল তবলা বাজানোর জন্যে। কঁদিন ধরে যেন একটা পাগলা ভুত শুভজিৎকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। কমলিকার চলে যাওয়া উপলক্ষে ওর মনে হচ্ছিল, ও ঠকে গেছে, তাই সারা পৃথিবীর উপর ও ক্ষেপে গিয়েছিল। আজ সকাল থেকে ওর মাথাটা ঠাণ্ডা ছিল, তারপর বৌদির ছেলে হওয়ার ঘটনায় ওর মনের মধ্যে একটা আনন্দের জোয়ার এসেছে। শুভজিৎ সেতার নিয়ে বসল সতরঞ্চির উপর। অনেকদিন পরে মনের আনন্দে সেতার বাজাল সে। বাজনার ভিতর দিয়ে নতুন জীবনকে ঘরের মধ্যে আহ্বান জানাল সে। ও যতক্ষণ বাজাল, সুরেশ ততক্ষণ তবলা সংগত করল। বাড়ির সকলে, এমনকি রণজিৎ পর্যন্ত, দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বাজনা শোনবার জন্যে। পাশের বাড়ি থেকে বুদ্ধের হাত ধরে মানিক এবং প্রীতি এসে হাজির হল। নতুন জীবনের সংবর্ধনা হল ওদের বাড়িতে। মা সকলের হাতে মিষ্টি দিলেন।

এমন সময় বাইরের দরজায় করাঘাত হল। শুভজিৎ দরজার দিকে ফিরেও চাইল না, সেতার বাজিয়ে চলল সে, মহা উৎসাহে মাথা নেড়ে নেড়ে সংগে সংগে তবলা বাজাতে লাগল সুরেশ। ভুতু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। বনওয়ারী প্রবেশ করল শুভজিতের ঘরে। অপরিচিত লোক দেখে রণজিৎ এবং মা ভিতরে গেলেন, ভুতু দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে। শুভজিৎ বনওয়ারীর দিকে ফিরেও চাইল না, পুরনো ঘরে নতুন প্রাণের উদ্বোধনের সংগীত বাজিয়ে চলল সেতারে।

বনওয়ারী একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েছিল। সেতার শুনতে শুনতে বনওয়ারীর মুখেও আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা গেল। মা অথিতি দেখে ভিতরে গিয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন, বাজনা থামিয়ে শুভজিৎ বাইরের মানুষটির সংগে কথা বলবে। শুভজিতের বাজনা বন্ধ হল না দেখে উনি মাথায় ঘোমটা টেনে বাইরের ঘরের দরজার কাছে এলেন। বনওয়ারী একবার শুভজিতের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে ওর বাজনার তারিফ করল। তারপর মায়ের দিকে ফিরে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। শুভজিৎ

বনওয়ারীর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে ভুতুর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বাজাতেই লাগল।

বনওয়ারী চেয়ার ছেড়ে উঠে মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'বহিনজী, শুভবাবুর কাছে আমার নাম শুনে থাকবেন। আমি বনওয়ারী লাল বোথরা। আমি গ্যারাণ্টি দিয়ে বলছি, আপনার ছেলের ফিউচার খুব ব্রাইট আছে। এমন বাজনা আমি আগে শুনি নি। সামনের শীতকালে হায়দ্রাবাদে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন হবে। আমার ইচ্ছা, আপনার ছেলে যেন ওখানে বাজায়। ওখানে আপনার ছেলের যা খরচ লাগবে, তা আমি দেব।'

মায়ের মুখ খুশিতে চক চক করে উঠল, উনি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ওকে বলব।'

বনওয়ারী বলল, 'আমি সিনেমার প্রোডিউসার।' আপনার ছেলের সংগে আমি কিছু কারবার করতে চাই। তাতে আমারও লাভ, আপনার ছেলেরও লাভ। উনি আজ খুব মন দিয়ে বাজাচ্ছেন, আমি ওঁকে ডিসটার্ব করতে চাই না। আমি হলফ করে বলতে পারি, হায়দ্রাবাদে আপনার ছেলে সোনার মেডেল পাবেই। সারা ইণ্ডিয়ার মানুষ শুভজিৎ রায়ের নাম জানবে। তখন আমার ছবিতে ওঁকে কাজ দেব।'

মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, উনি বনওয়ারীকে কৃতজ্ঞতা জানালেন, ত্যরপর হাসিমুখে ফিরে চাইলেন শুভজিতের দিকে। শুভজিৎ কিন্তু একদৃষ্টে ভুতুর দিকেই চেয়ে রইল এবং এক নাগাড়ে বাজিয়ে চলল সেতার।

বনওয়ারী মাকে বলল, 'আপনি ওঁকে আমার কথা বলবেন। আমি আজ আসি।' বলে, একবার শুভজিতের দিকে, একবার সুরেশের দিকে, একবার ভুতুর দিকে চেয়ে দেখল। শুভজিৎ একবারও এদিকে মুখ ফেরাল না। মায়ের দিকে ফিরে দুহাত তুলে আবার নমস্কার জানাল বনওয়ারী, তারপর ধীরে ধীরে দরজার বাইরে পা বাড়াল।

বনওয়ারী চলে যাবার পর মা চিন্তা করলেন অনেকক্ষণ, বুঝলেন, এবার বোধহয় শুভজিতের সামনে সাফল্যের দরজা খুলবে। শুভজিৎ তখনও বাজিয়ে চলেছিল নতুন প্রাণের উদ্বোধনের সংগীত।

মা হাসিমুখে কী বলতে গেলেন ওকে, ও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে

ফিরে চাইল। মায়ের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, উনি ধীরে ধীরে রান্না-ঘরে চলে গেলেন। দুটি ঘণ্টা দ্রুতগতিতে এক নাগাড়ে রাগ সংগীত বাজানোর পর শুভজিৎ তার বাজনার গতিকে মন্দীভূত করল। খানিক বাদে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বেজে উঠল ওর সেতারে, সে গানের কথা হল, 'হে নূতন, দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ'। সে রাত্রে আশে পাশের সমস্ত বাড়ির জানলায় জানলায় লোকেরা উৎকর্ণ হয়ে শুভজিতের বাজনা শুনতে লাগল। জ্যোৎস্না-সিক্ত রাতের আকাশ সুরের অর্ঘ সাজিয়ে নতুনকে আহ্বান জানাতে লাগাল!

আঠারো

রাতটা ভাল করে ঘুম হল না কমলিকার। সমস্ত বাড়িটা এক গাদা প্যাকিং-বাক্সে বোঝাই হয়ে আছে। মেজের উপর যে যেখানে পেরেছে শুয়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ভরে গেছে সারা ঘর। আলো না জ্বালিয়েও কমলিকা দেখতে পাচ্ছিল সব কিছু। আলো আসছে বাইরে থেকে।

ঘরের এক কোণে সতরঞ্চির উপর শুয়ে আছে মিঠু। গা থেকে চাদরটা সরে গেছে। বালিসটা মাথার নিচে নেই, পায়ের দিকে শতরঞ্চির বাইরে পড়ে আছে। শতরঞ্চিটা এলোমেলো, মিঠুর আদ্দেক শরীর শতরঞ্চির উপর, বাকি আদ্দেকটা বাইরে।

কমলিকা উঠে পড়ল। বালিসটা মিঠুর মাথার নিচে ঢুকিয়ে দিল, শতরঞ্চিটা ঠিক করে দিল, খলিত চাদরটা আবার ওর গায়ের উপর টেনে দিল।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখল সে। পূর্ণচন্দ্র ওর দিকে চেয়ে হাসছে। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। জানলার সামনে অনেকগুলো বড়ো বড়ো মোট জড়ো করা রয়েছে, তাদের পাশে এক কোণে মিঠুর সেতারটা পড়ে আছে, অবহেলিত, অনাদৃত। চাঁদের আলো পড়ে' সেতারটাকে বাস্তব বলে মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল, যেন স্বপ্নে দেখা কোন জিনিস। কমলিকা এগিয়ে এল, সেতারে একবার কান ঠেকিয়ে কী যেন শুনতে চেষ্টা করল, তারপর ধীরে ধীরে সেতারের গায়ে কুণ্ঠিত আদরের হাত বুলিয়ে দিল।

জন্ম থেকে আঠাশ বছর পর্যন্ত কলকাতার বুকে কেটেছে কমলিকার।

কলকাতার সংগে ওর নাড়ীর যোগ। আজ ওরা চলে যাবে আসানসোলে। আটাশ বছরের নাড়ীর যোগ ছিন্ন হবে এবার। গতকাল ও গিয়ে বাবা, মা, মিতালি, এবং আরও অনেকের সংগে দেখা করে এসেছে। কদিন ধরে' ও সমানে চেণ্টা করেছে আসানসোলে চলে যাবার, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর রাজি করতে পেরেছে মণিকে, আজ যাবার ঠিক প্রাক্‌কালে ওর মনটা একবার পিছনের দিকে ফিরে তাকাল।

ও জানে, আর ফিরে তাকিয়ে লাভ নেই। মণি তো ওদের সহজে নিয়ে যেতে চায় নি আসানসোলে, অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পর রাজি হয়েছিল, এখন আর পেছোনো যায় না। ও নিজেই নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ততা চেয়েছিল, অনিশ্চয়তার বিনিময়ে। স্থায়ীত্ব চেয়েছিল হাসি-রূপ-গানের বিনিময়ে। তা-ই ও পেতে চলেছে। তবে আর আক্ষেপ কেন?

বীণাবাদিনীর কথা মনে পড়ল কমলিকার, স্বপন-মুরারি-গৌতমের কথা মনে পড়ল, পীযুষের কথা, পীযুষের বিশ্বাস ঘাতকতার কথা। জীবনে কোনো কোনো ঘটনা কখনো চিরদিনের মতো রহস্যাবৃত থেকে যায়, পীযুষ সম্পর্কে স্বপনের অনুমানের কারণটাও তেমনি রহস্যাবৃত রয়ে গেল। পীযুষের বিশ্বাসঘাতকতার কথা কোন্ সূত্র থেকে যে স্বপন জানতে পেরেছিল, তা হয়তো চিরদিনের মতো ওর অজানা রয়ে যাবে। শেষ দিন অফিসে ওর প্রতি ক্যাকাবাবুর অনুনয় ওর কানের ভিতর বাজতে লাগল। গৌতম কেঁদে ফেলে বলেছিল, কমলদি, আমাদের ছেড়ে সত্যিই চলে যাচ্ছেন?' যে গৌতমকে ও বিশেষভাবে কখনও মনে রাখে নি। আজ বারবার তার কথাও মনে পড়তে লাগল কমলের। এমনকি অনুকূলের সংগেও একটা আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কমলিকার। তার কথাও মনে পড়তে লাগল বারবার।

সব ভাবনার মধ্যে যে ভাবনা ছায়ার মতো অনুক্ষণ ওর মনকে অনুসরণ করতে লাগল, সে হল শুভজিতের ভাবনা। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই শুভজিৎকে পরমাত্মীয় বলে মনে হয়েছিল ওর। এতদিনের পরিচয়, এতদিনের ভাললাগা, শুধু একটা দিন। শুধু একটা দিনের জন্যে, ওর সংযমের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল, শুধু একটা মাত্র দিন। আজ আর তার জন্যে কোনো লজ্জাবোধ ওর মনের মধ্যে নেই। সেই একটা দিনের স্মৃতি ওর সারা জীবনের সম্বল হয়ে রইল। এই স্মৃতি ওর একান্ত নিজস্ব, আজ থেকে বহু বছর

বাদে আর পাঁচজনের সংগ থেকে দূরে থাকার মুহূর্তে, এই স্মৃতির টুকরোটা কখনও কখনও ওর মনকে বিচিত্র এক বিষণ্ন মাধুর্যে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সারারাত জেগে কাটিয়ে ভোরের দিকে অশান্ত, অস্থির মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কমলিকা। যখন ঘুম ভাঙল, দেখল, মিঠু তখনও ঘুমিয়ে, সকালের রোদে শহর কলকাতার আকাশ ঝলমল করছে।

ঘুম ভাঙতে প্রথমেই মনে পড়ল, আজ বিকেলের ট্রেনে কলকাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। যে কলকাতার সংগে ওর আঠাশ বছরের যোগ। মিঠুকে জলখাবার খাইয়ে দশটার সময় শেষ বিদায় জানাতে মিঠুর হাত ধরে কমলিকা এল শুভজিতের ঘরের দরজায়। কিন্তু, একি? দরজার সামনে একটা ছোটখাট জনতা, গলির প্রান্তে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে! কমলিকা ভয় পেল, ওর বুকের মধ্যে মুগুরের মতো বাজতে লাগল, শুভজিৎ কি অসুস্থ? তাকে কি ওরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে? জনতা ভেদ করে' শুভজিতের বাড়ির দিকে এগুতে পারল না কমলিকা; উঁকি মেরে বাইরের ঘরটার দিকে চাইবার চেষ্টা করল ও; ঐ ঘরের সংগে ওর একটা সুখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, একটা দুঃখের স্মৃতি; একটা গোপন লজ্জার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, একটা বেদনার স্মৃতি।

জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করল কমলিকা, পারল না। জনতার সংগে মিঠু আর ও একাত্ম হয়ে গেল। হঠাৎ মিঠু বলে উঠল। 'মা, ঐ দ্যাখো, শুভদা আসছেন।' কমলিকা ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল, চকিতে মুখ তুলল, দেখল, বাড়ির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল গর্বিত এক শুভজিৎ, বাইরে এসে ও হাসিমুখে এগিয়ে গেল সামনে দাঁড়ানো ট্যাক্সির দিকে। ওর হাতে ধরা রয়েছে সেতার। কোথায় যেন চলেছে শুভজিৎ! কোথায় চলেছে? কোথায়?

ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুভজিৎ ভাবছিল, এ বাড়িতে এতদিন আমি ছিলাম রাজার মতো, আজ আমার যাবার সময় হয়েছে। কতদিন আর গদি আঁকড়ে থাকব? এখন যে সিংহাসনের ভাগীদার জুটেছে, দাদার নতুন ছেলে! এক আকাশে দুই চাঁদ সম্ভব নয়, এক সিংহাসনে দুই রাজাও নয়। এবার নতুনের কাছে মাথা নিচু করে সরে যেতে হবে আমাকে। তোমার হল শুরু, আমার হল সারা!

চিন্তাতে ছেদ পড়ল শুভজিতের! কোথা থেকে এক বৃদ্ধ এসে ওর হাত ধরল। বলল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' বৃদ্ধের দিকে ফিরে চাইল শুভজিৎ। দেখল, ও ইতিমধ্যে নিজের জগতে হারিয়ে গেছে। শুভজিৎ ভাবল, শুধু বৃদ্ধ নয়, আমরা সবাই সর্বদাই নিজের নিজের জগতে বিচরণ করি। আমরা কেউ কারো কথা বুঝিনা, একেবারে বৃদ্ধের মতো। যতক্ষণ অন্যের জগতের সংগে আমার জগতের বিরোধ নেই, ততক্ষণই শান্তি। বৃদ্ধের জগতের সংগে প্রীতি বৌদির জগতের নিত্য বিরোধ, তাই প্রীতি বৌদির নিত্য অশান্তি। আমার জগৎ আমার, শুভজিৎ ভাবল, কমলিকার জগৎ কমলিকার। যতদিন দুটো জগতকে আলাদা করে চেনা যায় নি, ততদিনই শান্তি ছিল। আমার কাছে আমার জগৎ যেমন সত্য, কমলিকার কাছে তার জগৎও তেমনি। আমি আর নালিশ জানাবো না, শুভজিৎ ভাবল। আমি শিল্পী, আমি এই পৃথিবীতে এসেছি সকলকে দেবার জন্যে, পাবার জন্যে নয়। চন্দ্রানী আমাকে নিঃশর্ত ভাবে ক্ষমা করে চলে গেছে, আমিও কমলিকাকে নিঃশর্ত ভাবে ক্ষমা করে চলে যাব।

কিন্তু বনওয়ারীলালকে ক্ষমা করা যায় কি? বনওয়ারীর দল শুধু ব্যবহার করবে আমাদের, আর আমরা শুধু ব্যবহৃত হব—তাই মা যখন সেদিন হাসি-হাসি মুখ করে বনওয়ারীর প্রস্তাব ওকে জানালেন, এক মুহূর্তে রুখে উঠেছিল ওর মন। এ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, ঐ জানোয়ারটার টাকায় আমি হায়দ্রাবাদ যেতে চাই না!'

মা অবাক হয়ে জিগেসে করেছিলেন, 'কেন?'

শুভজিৎ শুধু বলতে পেরেছিল, 'সে অনেক কথা!'

মা হতাশ হয়ে বলেছিলেন, তুই তা হলে হায়দ্রাবাদে যাবি না?'

দৃঢ় স্বরে উত্তর করেছিল শুভজিৎ, 'হায়দ্রাবাদে আমি যাবই, এবং আশা করি, সোনার মেডেলও পাব। কিন্তু, ঐ বদমাশটার সাহায্য নিতে আমার ঘেন্না হয়।'

'তবে টাকা পাবি কোথায়?'

'যে ভাবেই হোক যোগাড় করতে হবে!'

'যদি সোনার মেডেল না পাস?'

শুভজিতের মুখে হাসি ফুটেছিল তখন, 'সোনার মেডেল পাব কিনা জানি না, কিন্তু লোকে এবার আমাকে চিনবে। গত আট দশ মাসে আমি অনেক

শিখেছি। এতদিন শুধু নিজের জন্যে বাজিয়েছি, এখন থেকে সকলের জন্যেও বাজাতে পারব।

জনতা ভেদ করে সেতার হাতে ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল শুভজিৎ। কমলিকা ভেবে পেল না, শুভজিৎ কোথায় চলেছে। কাকেও জিগ্যেস করতে পারল না। মিঠু প্রশ্ন করল, শুভদা কোথায় যাচ্ছে, মা?'

কমলিকা মিঠুর কথার উত্তর দিল না, শুধু ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ওকে চুপ করতে বলল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, শুভজিতের মা এবং প্রীতি বৌদি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। দেখল, ভুতু খালি ঘর বার করছে। একবার ছুটে এসে কমলিকাকে বলে গেল, 'আমার ভাই হয়েছে। মা ভাইকে নিয়ে ওপরের ঘরে শুয়ে আছে।' কমলিকা ওর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল একবার, ভুতু আবার দৌড়ে চলে গেল বাড়ির ভিতর। শুভজিতের মা কমলিকাকে লক্ষ্যই করলেন না, প্রীতি বৌদি ওর দিকে চেয়ে হাসি মুখে ঘাড় নাড়ল। কমলিকার কানে গেল, প্রীতি বৌদি বলেছে, 'কাকিমা, আপনি দেখবেন, শুভ ঠিক সোনার মেডেল নিয়ে আসবে।' কমলিকা শুনল, মা বলছেন, 'হ্যাঁ গো, সোনার ভরি কত করে আজ কাল?' প্রীতি বৌদির কথাটা কানে গিয়েছিল কমলিকার। মায়ের কথাটাও কানে গিয়েছিল, কিন্তু, মনের মধ্যে প্রবেশ করেনি। ও ভাবতে লাগল, কোথায় গিয়ে সোনার মেডেল আনবে শুভজিৎ?

ট্যাক্সির পিছনের ট্রাঙ্কে মালপত্র গুছিয়ে তুলছিল শুভজিৎ, পাশে দাঁড়িয়ে সুরেশ ওকে সাহায্য করছিল। সুরেশকে কমলিকা আগে কখনও দেখে নি। ভাবতে লাগল, ঐ লোকটাকে। ওর বদলে কমলিকা নিজে যদি সাহায্য করতে পারত শুভজিৎকে, ও ভাবল। সম্মিলিত জনতা শুভজিৎকে সম্বর্ধনা জানাতে লাগল' কমলিকা অশ্রু সজল চোখে চেয়ে রইল শুভজিতের দিকে।

শুভজিৎ মাল গুছিয়ে তুলতে তুলতে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। মাল গুছোনো ওর পছন্দ হ'ল না। কিছু জিনিস বার করে নিয়ে ও নতুন করে গুছাতে লাগল। জিনিস পত্রের মধ্যে একটা বড়ো সড়ো লাগেজ আছে। আর আছে সেতার, তবলা, আর তানপুরা। লাগেজটায় দুজনের

জিনিস আছে, শুভজিতের এবং সুরেশের। ট্যাক্সির পিছনে জায়গা যতটা আছে, মাল তার থেকে বেশি। কিছুতেই সব জিনিস ধরানো যাচ্ছে না।

সম্মিলিত জনতা শুভজিতের শুভানুধ্যায়ী। কী ভাবে গুছোলে ঠিক হবে সে ব্যাপারে সকলেই উপদেশ দিচ্ছে। জনতার উৎসাহের শেষ নেই।

শুভজিৎ হেসে জনতার দিকে ফিরে চাইল। এবার চোখে পড়ল, জনতার একেবারে পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে কমলিকা। এত লোকের মধ্যে সে যেন একেবারে একা। শুভজিৎ একবার ট্যাক্সির দিকে চেয়ে দেখল, একবার সুরেশের দিকে, জনতার মধ্যে অন্তত জন কুড়ি মানুষ, কাকেও দেখতে পেলনা শুভজিৎ। শুধু ওর চোখে পড়ল, মিঠুর হাত ধরে সবার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিষণ্ণ এক কমলিকা।

আবার ট্যাক্সির দিকে চেয়ে দেখল শুভাজিৎ, তারপর আবার কমলিকার দিকে। কমলিকার চোখের সংগে শুভজিতের চোখের মিল হল। শুভজিৎ কমলিকার চোখে বেদনা দেখল।

জনতা তখনও উপদেশ দিয়ে চলেছে। উত্তেজিত ভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা। ওদিকে সবকটি জিনিসকে ট্যাক্সির ভিতরে ঢুকিয়ে দেবার ব্যর্থ চেণ্টা করছে সুরেশ। শুভজিৎ ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল, মালপত্রের ভিতর থেকে তানপুরাটা তুলে নিল ও।

তানপুরা হাতে নিয়ে ধীর পায়ে কিন্তু অসংকোচে কমলিকার দিকে এগিয়ে গেল শুভজিৎ। কমলিকা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল শুভজিতের দিকে, তার চোখের কোলে দু ফোঁটা জল। জনতা তখনও উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

শুভজিৎ এগিয়ে গেল কমলিকার কাছে, কোনো কথা বলল না, শুধু তানপুরাটা তুলে দিল কমলিকার হাতে।

কমলিকা দু হাত বাড়িয়ে তানপুরাটা বুকের কাছে টেনে নিল। একবার শুভজিতের দিকে চাইল। শুভজিতের মুখে হাসি। কমলিকার চোখে জল।

ট্যাক্সি চালক ব্যস্ত হয়ে উঠল ; সুরেশকে ডেকে বলল, 'আপনাদের আর কত দেরি ? অনেকক্ষণ হয়ে গেল যে।'

সুরেশ বলল, 'এক মাসের জন্য আমরা বাইরে যাচ্ছি। দেরি তো একটু হবেই !'

ট্যাক্সি চালক হতাশার ভংগী করে চুলে হাত বোলাতে লাগল।

শুভজিৎ ট্যাক্সির কাছে ফিরে গেল। আবার ফিরে চাইল কমলিকার দিকে।

তানপুরাটা সরে যেতে জিনিস গুছোতে আর অসুবিধে হল না সুরেশের।

সুরেশকে নিয়ে ট্যাক্সির ভিতর উঠে বসল শুভজিৎ। জনতা শুভজিৎকে হাত নেড়ে বিদায় জানাতে লাগল। ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করল।

কয়েকটি ছেলে ট্যাক্সির পিছন পিছন ছুটল। গলির মোড়ে এসে বাঁ দিকে মোড় ঘুরল ট্যাক্সিটা। শুভজিৎ ঘাড় কাত করে জনতার দিকে ফিরে চাইল। কমলিকার দিকে চেয়ে হাত নাড়াতে লাগল। কমলিকা হাত নাড়াল না, শুধু চেয়ে রইল। শুভজিতের মুখে হাসি। কমলিকার চোখে জল।

কমলিকা এতক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবার তার পা দুটো সবল হল। ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল সে। এক পা এগুতে না এগুতে ট্যাক্সি বড়ো রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হল। কমলিকা দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে চেয়ে দেখল। দেখল, জনতা অদৃশ্য হয়েছে।

শুভজিতের মা এবং প্রীতি বৌদিও ফিরে গেছেন ঘরের ভিতর। আবার চেয়ে দেখল চারদিকে ; কেউ নেই। কমলিকা একলা দাঁড়িয়ে রইল পথের উপর, পাশে মিঠু, হাতে তানপুরা।

একবার পিছন ফিরে শুভজিতের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখল কমলিকা, তারপর মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মিঠু এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। মিঠুর হাতে তানপুরাটা তুলে দিল কমলিকা।

মিঠু বলল, 'মা, এটা নিয়ে আমি কী করবো ?'

'এটা যত্ন করে তুলে রেখো। একেবারে তোমার বুকের কাছে,' মৃদুকণ্ঠে, প্রায় ফিস্ ফিস্ করে, বলল কমলিকা। তারপর পা চালিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।
